# FAGUN KUYASHA

Gargi Bhattacharya

**COPYRIGHTED MATERIAL**

# ফাগুন কুয়াশা

গার্গী ভট্টাচার্য

***To my departed friend SONIA who has lost her battle with blood cancer in the year 2012...***

***As a medium, am still in touch with her .....***

***She was (for me- is) the one who inspired me to continue writing despite my failure to publish in leading bengali magazines.***

***Love you SONIA--***

***veedukolee vedikaina....***
***veedaleni snehamaina...***

***ananthama oho oho***
***asanthama oho oho***

***happydays happydays happydays***

***(her very own Telugu song, lovely tune)***

# ১

জেগে উঠেছিলো চাঁদ কফিবনে । পুরনো দিনের অভিনেত্রী চাঁদ ওসমানিকে দেখে তার নামে রেখেছিলেন মা – চাঁদ । চাঁদ সেনগুপ্ত ।

পেশা ছিল শিক্ষকতা । ব্যাঙ্গালোরে একটি স্কুলে পড়াতো চাঁদ । তারপর স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে চলে এসেছে পাহাড়িয়া কফির দেশ কুর্গে । কুর্গ কর্ণাটকের একটি হিল স্টেশান ।

এটি মূলত কোদাওয়া প্রজাতির বাসস্থান । যদিও এখন নানান মানুষ বসবাস করেন ।

চাঁদ সেরকমই একজন । সে শিক্ষকতা করতে করতেই হোমিওপ্যাথির প্র্যাকটিস করতো । এখন কুর্গে এসে প্র্যাকটিস জমিয়ে বসেছে ।

এই পাহাড়ি অঞ্চলের যেখানে সে থাকে সেখানে কাছাকাছি কোথায় হেলথ সেন্টার নেই। কাজেই স্থানীয় মানুষ খুবই উপকৃত একজন ডাক্তার পেয়ে। লোকে বলে চাঁদের হাতযশও আছে। সে রুগির দিকে চাইলেই রোগ সেরে যায়।

কোদাওয়া মানুষেরা ওকে দেবী জ্ঞানে পুজো করে।

সন্ধ্যেবেলায় সে যায় ওর প্রতিবেশী প্রফেসর শ্রোত্রির বাড়ি। প্রফেসর পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে এখানে আছেন। একটি বাড়ি কিনেছেন। বেশ বড় পুরনো বাড়ি। সেখানে উনি থাকেন। উনি মারাঠি ব্রাহ্মণ। শ্রোত্রিয় গোত্রের ব্রাহ্মণ।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ওঁনার অনেক ছাত্র। ছাত্রী দেখা যায়না। সবাই গুরুকূল প্রথায় থেকে খেয়ে ওঁনার গৃহে পরম আদরে পড়াশোনা করে। চাঁদের বড় ভালোলাগে। আজকালকার যুগে এরকম সিস্টেম তো দেখা যায়না। ভদ্রলোকের সঙ্গে নানান ধরণের ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনাও হয়। ভদ্রলোক কত কিছু জানেন। ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক কিন্তু জানেন বিজ্ঞান থেকে টেকনোলজি থেকে সাহিত্য পর্যন্ত।

খুব জ্ঞানী মানুষ উনি। খুব শ্রদ্ধা হয় ওঁনাকে দেখে। উনি বলেন সবকিছুই তো মিলছে

গিয়ে দর্শনে। রান্নারও একটা দর্শন আছে। কী বলতো চাঁদ ?

– কী ?

– কারো মনজয় করতে হলে পেট থেকেই শুরু করো ! বলেই হাহাহা করে দিলখোলা হাসি হেসে ওঠেন।

বাড়িটা বড় । সামনে পেছনে সবুজ ফুলের বাগান । কোথাও সবুজ ঘাসের মাঠ ।

একটা শারীরিক কসরতের জায়গাও আছে । ওখানে বিভিন্ন রকমের শারীরিক কসরৎ শেখানো হয় । প্রফেসর বলেন এতে মনের জোর বাড়ে ।

ওঁনার ছাত্ররা ওঁনার সন্তানের মতন । ওঁনাকে স্যার না বলে সবাই পাপাজি বলে।

মহারাষ্ট্রে উনি আর যাননা । বছরের ১২ মাস চাঁদ দেখে যে উনি এখানেই অধিষ্ঠিত ।

বিয়ে করেছিলেন কিন্তু পত্নী বিয়োগ হয়েছে বহুদিন । নি:সন্তান । সেইজন্যেই কিনা জানা নেই ছাত্রদের উনি নিজ পুত্রবৎ স্নেহ করেন । জিজ্ঞেস করলে বলেন : এরাই তো আমার ছেলেপুলে । কে বলে আমি নি:সন্তান ? আমার তো জগৎ জোড়া সন্তান !

তা বটেই ভাবে চাঁদ । আর জগৎ জোড়া সন্তান হতে গেলেও তো পিতাকে স্নেহছায়া দিতে হয় মমতা ভরেই । নাহলে সবাই আসবে কেন ?

প্রফেসর এই বিষয়ে ১০০ তে পুরো ১০০ ।

উনি কফিও বানান চমৎকার । ভর সন্ধ্যে বেলায় রুগি না এলে চাঁদ ওঁনার গৃহে কফিপান করতে যায় । ঘন কফি খেয়ে মনটা ফুরফুরে হয়ে যায় । এই দক্ষিণ ভারত তো ফিল্টার কফির দেশে । দুই ধরণের কফি দেখেছে চাঁদ । অ্যারাবিক আর রোবাস্টা । একটু দূরে মিস্টার জোসেফের কফি বাগিচা । উনি সুদূর বেলজিয়াম থেকে এসেছিলেন । এখানে এখন কফির চাষ করেন সঙ্গে আরো ফলন হয় ওঁনার অন্য বাগানে । সেসব রপ্তানি করেন বিদেশে । বেলজিয়ামে ওঁনার পিতা

ছিলেন পাদ্রী । সেখানে কোনো এক মন্সাট্রীতে ওঁনার পিতা ওয়াইন তৈরি করতেন প্রাচীন বেলজিয়ান পদ্ধতিতে বলে জানা গেলো । এখানেও ভদ্রলোক ওয়াইন পার্লার খুলেছেন তবে সবই কেনা ওয়াইন । দোকানটির নাম রোজমেরি ।

পরিচয় হয়েছে চাঁদের সঙ্গেও । ওকে ওয়াইন টেস্ট করতে দিয়েছিলেন জোসেফ সাহেব কিন্তু ওর ভালোলাগেনি । তাতে হেসে উঠে মিসেস জোসেফ বলেন : ওহ ! দে অনলি ড্রিংক ওয়াটার । মিসেস জোসেফও খুব ভালোমানুষ । ওঁদের পুত্র বেলজিয়ামে । সে ইন্ডিয়াতে থাকবে না – ইট্স্ সো ডার্টি , ফিলদি । হাউ কাম পিওপেল স্টে হিয়ার ! ইট ইজ আ হেল । বোত অফ উ উইল ডাই মামা !

শোনা যায় পরিষ্কার মুম্বাই এয়ারপোর্টের টয়লেটে ঢুকে এই ছেলেটি যেন্নায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো ।

পরে বলেছিলো যে এরকম নোংরা দেশে সে আর থাকবে না । ফিরে যায় বেলজিয়ামে ।

মনে মনে হাসে চাঁদ । এই নোংরা দেশেই তো সারাটা জীবন সে কাটিয়ে দিলো !

সেও কি পারতো ইউরোপে গিয়ে সুখি হতে ? যাবার সুযোগ যে আসেনি তা তো নয় !

কিন্তু ওই প্রাণহীন , অতি ভদ্র , বিনয়ী দেশে সে সুখ পাবেনা সে জানতো । তাই সে এখানেই রয়ে গেছে । এখানে লোকের ভীড় , হৈ হট্টগোল , ফুচকা , ভেলপুরি , সিঙারা --কিছু না থাকার ভেতরেও সব থাকার আনন্দ খুঁজে নেওয়া এতেই সে খুশি । আসলে মানুষ তো অভ্যাসের দাস ।

# ২

এই অঞ্চলেই আরেক প্রান্তে থাকে বব । বব ছিল বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার । চাকুরিক্ষেত্রে একবার চুরি করে হাতে নাতে ধরা পড়ায় তাকে বিতাড়িত করে কোম্পানি ।

তারপর সে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে । এখন সারাটাদিন সে কম্পিউটারে বসে অ্যাডোবি ফটোশপে ইমেজ এর কাজ করে । বেশ কিছু গ্রাফিক্স পোর্টালেও ফ্রিলান্সিং কাজ করে । ভালো হাত ওর । লোকে বলে ও সারাটা দিন শুধুই ফোটোশপ খায় ও পান করে । একবার কাজের ফাঁকে ও দুপুরে বেরিয়েছিলো । রাস্তায় নেমে দেখে একদঙ্গল কালো মানুষ যাচ্ছে কোদাল ঝুড়ি নিয়ে । তখন একজনের মুখে ওর চোখ পড়ায় ও হঠাৎ বলে বসে: এই যে হে তোমার মুখখানা এত কালো কেন ? চিন্তা নেই তুমি ফটোশপের ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট ফিলটারটা দিয়ে মুখের রং খানা সাদার দিকে নিয়ে যেতে পারো তো !

লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে তারপরে চলে যায় । তখন আনমনেই ববের খেয়াল হয় যে ও এতক্ষণ কম্পিউটারের কথা বলছিলো । নিজেই মাথা চুলকে হেসে ওঠে ।

অনেকে বলে বব চুরির দায়ে ধরা পড়লেও আদতে চুরি করেনি । ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো । এই ববের আরেক ইতিহাস আছে । ওর বাবা অমিত ছিলেন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার । কাজ থেকে অবসর নিয়ে উনি এই জায়গায় কফি প্লান্টেশান কিনে চাষবাস শুরু করেন । যৌবন কালে মুম্বাইতে এক ক্লাবে একটি বার ড্যান্সারের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করতে চান । বন্ধুরা বেট ফেলে বলে– এটা তোর জেদ । বাস্তবে এটা অসম্ভব । ভদ্রলোকও নাছোড় বান্দা । উনি সোজা গিয়ে প্রস্তাব দেন অলিভিয়াকে ।

ড্যান্সার অলিভিয়া গোয়ানিজ ছিলো । উর্ধাঙ্গ অনাবৃত করে সে নাচতো । তবে এটা বাইরের লোকে জানতো না । কিছু মেম্বারকে ওখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত । তারাই শুধু এই নাচ উপভোগ করতে পারতেন । অলিভিয়া কিন্তু এই নাবিক কারিগরটিকে ভালোবেসে ফেলে । ক্রমশ ওদের প্রেম বাড়তে থাকে এবং এক দিন ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় । মুম্বাইয়ের এক পশ এলাকায় ওরা বসবাস আরম্ভ করে ।

সেদিন সকালে হালকা নীল শাড়ি পরেছিল অলিভিয়া । পাতলা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে গোলাপি চামড়া । একটু ভারী ভারী লাগছে ওকে । পেটটা উঁচু হয়ে আছে । ওকে কাছে টেনে নিয়ে আলতো করে চুমু দিতেই ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় । অবাক হয় অমিত ।

আইভিলতা জড়ানো ব্যালকনিতে গিয়ে ওকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে । তারপর আদুরে গলায় বলে ওঠে : কী হল চলে এলে কেন ? আমাদের পরিবারে কি নতুন সংযোজন হতে চলেছে নাকি ?

অলিভিয়া গম্ভীর মুখ করে বলে ওঠে : হ্যাঁ ।

তাহলে তুমি এত গোমড়া মুখ করে আছো কেন ? এত সুসংবাদ !

না মনে অমি ---

কী ? লজ্জা পাচ্ছো?

নাহ্ ! মানে অনেক দিন ধরেই তোমাকে বলবো ভাবছি কিন্তু বলা হয়নি ।

কী বলবে ? বেটার লেট দ্যান নেভার -- এই তো এখন জানলাম !

নাহ্ অমি যা জেনেছো তা ঠিক জানো নি –

মানে ? অমিতের চোখ বড় বড় হয়ে যায় ।

এই সন্তান তোমার সন্তান নয় !

হতচকিত অমিত কিছু বলার আগেই অলিভিয়া বলে ওঠে :

আমাদের ড্যান্স ক্লাবের মালিক জনের সন্তন এটা । তোমার সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার চলার সময়ই আমরা শারীরিকভাবে মিলিত হই যার ফল এই সন্তান । কিন্তু অমিত আমি একে অ্যাবর্ট করাতেও পারবো না আর কোনো অনাথ আশ্রমেও রেখে আসতে পারবো না । তুমি যদি একে গ্রহণ না করো তাহলে আমার তোমাকে ত্যাগ করতে হবে ।

সুন্দর সোনারঙা সকালে উঠে অমিতের এই বিপর্যয়ের সংবাদ শুনতে ভালোলাগেনি নিশ্চয়ই কিন্তু যখন সে অলিভিয়াকে বিবাহ করেছিলো তখনই জানতো যে এর সঙ্গে কোনো না কোনো ঝঞ্ঝাট

এসে উপস্থিত হতে পারে তবুও ওকে তো অমিতের খুবই ভালোলেগে গেছিলো তাই এই সন্তানের পিতৃত্ব সে স্বীকার করতে পিছপা হলনা।

অলিভিয়া , অলিভিয়া মাই ডার্লিং কে বলেছে ও আমার সন্তান নয় ? আমার বীজজাত নয় বলেই সে আমার নয় ? দুনিয়া জানুক ও আমারই সন্তান , এই অমিত দত্তর সন্তান।

হালকা হাসি ছড়িয়ে গেলো অলিভিয়ার মিষ্টি মুখে। এত সহজেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সে ভাবেনি। সে ভেবেছিলো যুদ্ধ হবে , ঝড় বইবে , সংঘাতে ফেটে যাবে চরাচর। কিন্তু নাহ্ ! এ একেবারেই গোবেচারা ভালোমানুষ।

পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হল । যথা সময়ে বব জন্মালে ওরা দুনিয়াকে জানালো সে অমিতেরই সন্তান। শুধু অলিভিয়া ওর খ্রীশ্চান নাম দিলো জোর করে যাতে একটু তার দোষটার ছাপ থাকে সন্তানের অঙ্গে।

সেই বব ওর বাবার গৃহে এখানে থাকে । অলিভিয়া ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েক বছর হল গত হয়েছে। মরার আগে সে পুত্রকে একটি বাক্স দিয়ে গেছিলো।

তাতে ছিল একটি চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা ছিল তার জন্ম রহস্য। যা পড়ে অমিতের ওপরে যত শ্রদ্ধা বেড়েছিল ঠিক ততটাই ঘৃণা করতে শুরু করলো সে তার প্রয়াত মাকে। মায়ের জন্য আর এক ফোঁটা চোখের জল সে ফেললো না। পুরো মন বিষিয়ে গেলো তার। এক নাচনির সন্তান সে ? সমাজে তার এত শ্রদ্ধা , ভালোবাসা যা সে পেয়েছিলো সবই ভালোমানুষ বাবার জন্য যে আদৌ তার বাবা নয় ?

মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বব ধরলো ড্রাগস্ । বিপথে চলে গেলো । কুসঙ্গে পড়ে সে গাঁজা ইত্যাদির নেশা ধরলো । ইতিমধ্যে চাকরিতে ঢুকেছিলো বটে । সেইসব কান্ডকারখানার সুবাদেই চাকরিও খোয়ালো একদিন চুরির দায়ে । যদিও একদল ওর ওপরে আস্থা রাখেন যে ও নির্দোষ ।

বব খুব নম্র । চাঁদের ওকে ভালই লাগে । মাঝে মাঝে সে আসে ওষুধ নিতে ।

খুব মিহি স্বরে বলে : আই বিলিভ ইন হোমিওপ্যাথি । হ্যানিম্যান ওয়াজ গ্রেট । নাও ইভেন ইন অ্যালোপ্যাথি দে আর ট্রায়িং টু ট্রিট পিওপেল উইথ আ সিঙ্গল ইউনিক পেশেন্ট স্পেসিফিক ডোজ অ্যাট আ টাইম । হোমিওপ্যাথি ইজ গ্রেট ।

চাঁদের বিশ্বাস জন্মায় হোমিওপ্যাথিতে ওর শৈশবে টনসিল সেরে যাওয়াতে । তার আগে সে বহু চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও রোগ সারাছিলো না । রোজ জ্বর হত । স্কুলে যেতে পারতো না । শেষে অ্যালোপাথি ডাক্তার বললেন টনসিল অপারেশনের কথা । চাঁদ গান শিখতো । গলা খারাপ হবার ভয়ে সে অপারেশনে যায়নি । তখন ডাক্তারের পরামর্শেই সে হোমিওপ্যাথিতে শিফট্ করে এবং টনসিল সেরে যায় ।

পরে এই চিকিৎসা বিদ্যা রপ্ত করে । তবে ওর ধারণা যে হোমিওপ্যাথিতে ভালো চিকিৎসক না থকায় শাস্ত্রের বদনাম হয় । অনেকেই এতে বিশ্বাস রাখেন না , হোমিওপ্যাথি ফোবিয়া সৃষ্টি হয় ।

ববের যৌন সমস্যা আছে । ঠিক সমস্যা নয় যৌনতায় ভিন্নতা আছে । সে গে । সমকামী । থাকে এক সঙ্গী রফিকের সঙ্গে । রফিক

হায়দ্রাবাদী মুসলিম। দুজনে যৌন ক্রীড়ায় মেতে ওঠে স্বামী স্ত্রীর মতন। অ্যানাল সেক্স করে। সমাজে ওরা ব্রাত্য।

আমাদের সমাজে মানুষ মনুষত্ত্বের বিচারে কেমন তা দেখা হয়না কে কার সঙ্গে সেক্স করছে কিংবা তার লিঙ্গ কী সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কাজেই ববকে লোকে আড়ালে হেয় করে।

সে যে গে তা প্রথমে নজরে আসে ওর চাকরের। একদিন সে দুপুরে অকস্মাৎ ববের

বাড়ি চলে যায় ফেলে আসা মানিব্যাগ নিতে। তখনই জানালা দিয়ে দেখে দুই পুরুষের রমণ। উলঙ্গ বব তার পুরুষাঙ্গ দিয়ে রফিকের সারা শরীরকে আদর করছে।

চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় চাকর নটরাজের। জীবনে এরকম জিনিস সে দেখেনি!

একবার ওর এক বন্ধু ছাগলের সঙ্গে সেক্স করছিলো সে দেখেছে পাহাড়ের অন্যপাশে।

কিন্তু একই ধরণের মানুষের মধ্যে এইসব সে কোনোদিন দেখেনি।

তারপর দেশে দেশে রটি গেলো যে বব সমকামী।

তাতে অবশ্য ববের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। সে কাজ করতো নেটে। আর সামাজিক জীবন তার প্রায় নেই বললেই চলে। দু একজন মানুষের সঙ্গে সে মেশে কারণ এমনিই তাকে লোকে এড়িয়ে চলে। তাই এই দুর্নাম তার টুপিতে আরেকটা হাল্কা পালক মাত্র। রফিক ববের অ্যাসিস্টেন্ট। দুজনে এক সঙ্গেই বাস করে। আগে লোকে ভাবতো বন্ধু আর এখন জানে ওরা পার্টনার।

কূর্গে সাঁঝবাতি জ্বলে উঠলে বন্ধ হয় বিটস্ অ্যান্ড বাইটস্ এর খেলা শুরু হয় যৌন ক্রীড়া যাকে বব বলে – সাম এনজয়মেন্ট ইন ড্যাম বোরিং লাইফ ।

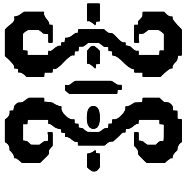

# ৩

তলা কাবেরী পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর উৎসস্থল। কুর্গেই অবস্থিত। ব্রহ্ম গিরি পাহাড়ে।

একটা পাহাড়ের ওপরে একটি বাঁধানো পুণ্য জলের উৎস। পাশের পুকুরে মিলেছে। পুকুরটা বাঁধানো। সেই জল মাটির তলা দিয়ে ১ কিলোমিটার পরে পাহাড়ে বয়ে চলে। এই বাঁধানো পুকুর হোলি। এখানে মহাদেবের পুজো হয়। বহু পুরনো একটি শিবলিঙ্গ এখানে রয়েছে। তুলা সংক্রান্তির সময় নাকি দেবী পার্বতী সশরীরে এই জলে আসেন। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বহু মানুষ এখানে আসেন। আসেন মনের শান্তির জন্য। যাগ যজ্ঞের জন্য। পিন্ড দানের জন্য। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। শুধু বসে থাকলেও পরম শান্তি মেলে। একটু দূরে আছে অনেক পাথরের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে খাড়া ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট উপত্যকার মতন সেখানে প্রাচীন কালে বহু মুণি ঋষি তপস্যা করেছেন বলে শোনা যায়। সপ্ত মহাঋষি এখানে বিশেষ যজ্ঞ করেছেন বলে জানা যায়। দূরে দেখা যায় ধূসর , কুয়াশা ময় পাহাড়ের দৃশ্য। সবুজ , লাল ,

মেটে , বেগুনি রঙয়ের কতনা শোভা । ব্রহ্মা , বিষ্ণু , মহেশ্বর নাকি এখানেই কাছে একটি প্রাচীন বৃক্ষের নীচে দেখা দিয়েছেন ঋষি অগস্ত্যকে ।

চাঁদ এখানে মাঝে মাঝে আসে ।

এখানেই সে দেখেছে তান্ত্রিক সাধক চিন্নাসোয়ামিকে ।

চিন্না মানে ছোট । স্বামীজি উচ্চতায় খাটো । মাথা নেড়া । অনেক পরে চাঁদ জেনেছিলো

যে ভদ্রলোক আদতে বাঙালী । পেশায় ছিলেন সার্জেন । ইংল্যান্ডের ডাবল এফ আর সি এস । ওঁনাকে দেখে ওঁনার বয়স বোঝার উপায় নেই তবে লোকে বলে ওঁনার বয়স ১০৯ বছর । ভীষণ জোরে হাঁটেন , যেকোনো জোয়ান লোক হাঁপিয়ে যাবেন ওঁনার সঙ্গে হেঁটে । আর যেকোনো মানুষকে দেখলেই যে বা যারা তাঁর কাছে এসেছেন উনি মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন । চিন্নাসোয়ামিজি কামাখ্যায় সাধনা করেছিলেন বলে শোনা যায় কিন্তু এখন উনি শিবের সাধনা করেন তাই তলা কাবেরীতে রয়েছেন । ভদ্রলোকের অনেক স্পিরিচুয়াল পাওয়ারের কথা শোনা গেলেও কেউ কোনোদিন ওঁনাকে কোনো ডাইরেক্ট মিরাকেল করতে দেখেনি ।

চাঁদ যখন ওঁনার সঙ্গে প্রথম দেখা করে উনি মন্দিরে বসেছিলেন । চাঁদকে দেখে বাংলায় বলে ওঠেন : মা , তোকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে ?

সেইদিনই চাঁদ জানতে পারে যে উনি বাঙালী । চাঁদ কাছে যেতেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে উনি চাঁদকে প্রণাম করেন । চাঁ আপ্লুত । অভিভূত । নিজের মনের কথা ওঁনাকে সে খুলে বলে । বলে একটি বাচ্চা

ছেলেকে সে কিছুতেই সারাতে পারছে না । ছেলেটি ভীষণ কঠিন একটি পীড়ায় জর্জরিত ।

অনেক বইপত্র ঘেঁটেও উপযুক্ত ওষুধ পাচ্ছেনা । তাই আজ মাথাটা একটু ফাঁকা করতে এই পূণ্যভূমিতে পা রেখেছে । শুনে সোয়ামিজি বলে ওঠেন : তুই চিন্তা করিস না ও ভালো হয়ে যাবে । তুই এর ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে পেয়ে যাবি । তবে যেই ওষুধই গ্রহণ করুক ওকে কিন্তু মাংস খাওয়া বন্ধ করতে হবে । শূয়োরের মাংস ।

আমাদের শরীরে শাক সবজিতেই বেশ চলে যায় । বলে উনি বৈজ্ঞানিক পার্সপেক্টিভ থেকে এই ব্যাপারে ডিটেল বিবরণ দিতে আরম্ভ করেন । প্রোটিন, কার্বস্ , ভাইটামিনস্ ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও আলোচনা শুনে চাঁদ স্পেলবাউন্ড ।

এরকম জ্ঞানী তান্ত্রিক জীবনে দেখেনি সে !

বাবা নিজেও শুধু সেদ্ধ ভাত আর সবজি সেদ্ধ খান । নিরামিষাশী । চাঁদ ভাবতো যে তান্ত্রিকেরা কেবল মাছ , মাংস আর মদ্যপান করেন ।

এই জ্ঞানী তান্ত্রিক মনে হয় সিদ্ধ পুরুষ । চাঁদ নিজে তো বিয়ে করেনি ।

সেক্স যে করেনি তা নয় । কিন্তু বিয়ে অবধি ব্যাপারটা গড়ায় নি । পরে আর বিয়ে করতে ওর ইচ্ছে হয়নি । একবার ওর এক বন্ধু বলেছিলো: আজ বুঝতে পারছিস না কিন্তু শেষ জীবনে খুব কষ্ট পাবি !

চাঁদ শুধু হেসেছিলো । পরে তো ও রুগির চিকিৎসায় নিজেকে নিয়োজিত করলো । এখন ওর এত রুগি এবং তারা উপকৃত যে শেষ

জীবনে ওর কোনো লোকবলের চিন্তা নেই উপরন্তু ও নিজেকে সুস্থ রেখে কাজ করে যেতে চায় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ।

এই তান্ত্রিককে দেখে সে আরো উৎফুল্ল । ১০৯ বছরে এই জীবনী শক্তি অভাবনীয় ।

একদিন চাঁদ ওঁনাকে জিজ্ঞেস করে : বাবা ( বাঙালী জানার পরে চাঁদ ওঁনাকে বাবা বলতো ) আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন ? শেখাবেন যোগ তন্ত্র ?

বাবা খুব রসিক মানুষ । মৃদু হেসে বলেন : আরে এতো সব ভন্ডের কারবার এখানে তোমার মতন ডাক্তারের এসে কাজ কী ?

চাঁদ নাছোড় বান্দা । সেও মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে : না না বাবা আপনাকে শেখাতেই হবে ।

বাবাও শেখাবেন না কিছুতেই ওকে বিরত করার চেষ্টা করে চলেছেন এমন সময় চাঁদ ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়ে দেয় ।

এরকম করলে কিন্তু আমি আর আপনার কাছে আসবো না ! বলেই আঁখি পল্লবে প্রায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নিয়ে আসে ।

নারীর চোখে জল দেখে স্বয়ং শিবশম্ভুও গলে যাবেন কাজেই বাবাও গললেন ।

তখন খুব মিহি স্বরে বললেন : আমি তো এইভাবে কাউকে দীক্ষা দিইনা মা তবে তুমি যখন বায়না ধরেছো তখন তোমাকে আমি কিছু বেসিক যোগ তন্ত্র শিখিয়ে দেবো তাতে তোমার কৌতুহলও মিটবে আর দীর্ঘায়ু হবে – সুস্থ , রোগহীন দেহে অনেক দিন বাঁচবে । তবে খাবার অভ্যাসটা বদলে ফেলো । নিরামীষ খাবার অভ্যাস করো । মাংস টাংস বেশি খেয়ো না !

চাঁদ রাজি হল। এবং ঠিক হল একটি স্পেসিফিক দিনে বাবা ওকে কিছু যোগ শেখাবেন। এই অসীম জ্ঞানী ও নম্র তান্ত্রিকের কাছে কিছু শিক্ষা নেবে ভেবেই ওর রোমাঞ্চ হচ্ছিলো। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

চাঁদ ভেসে যেতে চায় চাঁদের দেশে। তবে বিজ্ঞানে চেপে নয় যোগ তন্ত্রে চেপে।

# ৪

সকাল থেকেই গাঢ় কুয়াশা। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না ।

ফুলগুলোতে কুয়াশা কণা। মাধবের ফুলের ব্যবসা। মাধব মৈত্র।

বাঙালী আর কবিতা , ফুল এইসব নিয়ে চর্চা করবে না তাও কি সম্ভব ? কাজেই মাধবও অবসর নিয়ে ফুলের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। কবিতাও লেখে সে।

কিছুটা ছড়া কিছুটা লিমেরিক ধাঁচের । আর ফিলোসফার মাধবাচার্যের দ্বৈতবাদে সে বিশ্বসী। তার মতে দ্বৈত সত্তার দর্শন না থাকলে দুনিয়ার এত রঙ রূপ রস উপভোগ করবে কে ? আর সে পরজন্মে প্রচন্ডভাবে বিশ্বাসী। তার মতে এত সুন্দর পৃথিবী যখন এক জন্মে জানা সম্ভব নয় তখন পরজন্মে বিশ্বাস রাখাই সবচেয়ে ভালো তাহলে এই জন্মে কম চাপ পড়বে। ওর ফার্ম কফি ব্লসমস্

ভারতের প্রথম সংস্থা যারা হল্যান্ডের মতন ফুলপ্রেমী দেশেও গোলাপ এবং অন্যান্য ফুল রপ্তানি করেছে।

ভিশন ,অল ইউ নিড ইজ ভিশন টু রান আ বিজনেস অ্যান্ড টু বি সাকসেসফুল।

এই হল মাধবের মনের কথা। ও ঠিক কী চাকরি করতো তা কেউ জানেনা তবে ভালো কিছু নিশ্চয়ই করতো নাহলে ব্যবসা ফাঁদার পুঁজি পেলো কোথায় ?

ও বিয়ে করেনি। নিজের ফুলের বাগান নিয়েই আছে। তবে একটা লোকাল পার্টিতে ওর আলাপ হয়েছিলো চাঁদের সঙ্গে তারপর থেকে চাঁদ দেখছে যে সে চাঁদের প্রতি আকৃষ্ট। পরিণত বয়সের দুই নারী ও পুরুষের মধ্যের কেমিস্ট্রির

খোঁজ কে আর রাখে তবে বব একদিন চাঁদকে জিজ্ঞেস করেছিলো :

ডু ইউ লাভ মাধাভ ?

চাঁদ কোনো উত্তর দেয় নি শুধু অবাক চোখে চেয়েছিলো ববের দিকে। কারণ নারী পুরুষের মধ্যে লাভ শব্দটার তাৎপর্য –কি ববের মতন সমকামী বোঝে ?

ববের পার্টনার রফিকের সাজগোজ মেয়েদের মতন। বড় লম্বা চুল পনিটেল করা , রঙ চঙে পোশাক আশাক , হাতে চুড়ি , কানে হীরের ছোট দুল অন্য কানে মাকরি। সবচেয়ে আশ্চর্য হল সে মুসলিম হয়েও শুয়োর খায়। কারণ বব শুয়োর খায়।

বব তো মুক্তমণা। আর কূর্গে বুনো শূকর খুবই প্রিয় খাদ্য মানুষের।

ওদের পান্ডি কারি তো জগৎ বিখ্যাত।

রফিক খুব কম কথা বলে। নমাজ টমাজ পরে কিনা জানা নেই কেউ দেখেনি।

দিনগুলি ওদের কাটে কাজকামে। সারাদিন কাজেই মেতে থাকে আর রাতে কামে।

তবে চাঁদ স্টাডি করে দেখেছে যে ওরা দুজনেই বেশ মানুষ ভালো। পরপোকারী আর নম্র ও ভদ্র। শুধু ববের ঐ চুরি করে চাকরি যাওয়র ব্যাপারটা আর ড্রাগস্ ইত্যাদির ব্যাপারটা ব্যাতীত। তবে সেগুলো তো সেই অর্থে এখানকার কোনো মানুষের ডাইরেক্ট ক্ষতি করছে না কাজেই চাঁদের ওদের সঙ্গ ভালই লাগে।

তাছাড়া ও তো ডাক্তার। ওর কি আর অত বাছ বিচার করলে চলবে ?

ডাক্তার আর উকিলের কাছে তো সব ধরণের মানুষই আসেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তারা ওদের ক্লায়েন্ট ও রুগি। কাজেই অন্যদের অসুবিধা হলেও চাঁদের কোনো অসুবিধ হয়না ইন্টার‍্যাক্ট করতে।

মাধবের গৃহে চাঁদ কখনো একা যায়নি। তবে মাঝে মাঝে ওর খুব ইচ্ছে করে একা যেতে। কারণটা কিছুই না মাধব খুব সুন্দর করে এক একটা ফুলের ইতিহাস বোঝান উৎসাহীদের। সেই ব্যাপারটা চাঁদ দেখেছে। ওর ভালো লাগে।

ওর কেন যেন যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান নিতে খুব ভালোলাগে আর বিশেষ করে শিক্ষক যদি হন নম্র। তাই তান্ত্রিক বাবা ওর প্রিয় শিক্ষক হতে পারেন পারেন মাধবও। মাধবের বড় ব্যবসা ও অনেক অর্থবল থাকলেও তার একটুও অহংকার নেই। যেন মাটির মানুষ

। এই গুণ চাঁদকে খুব আকর্ষণ করে তবে একে সে প্রেম বলতে নারাজ।

কোন ফুল কবে ফোটে , প্রথমে কোন রংয়ের হয়,কত রঙের হয় , কোন ফুল কখন ঝরে যায় কোনটায় কটা পাপড়ি থাকে সব নিঁখুত বর্ণনা দেন মাধব । তখন মনে হয়না উনি বটানিস্ট নন একজন ব্যবসাদার। ফুলের কারবারী। ওঁনার ফুলের বিশাল বাগান দেখতে গেলে টানা তিনদিন লাগে।

রাশি রাশ ফুল সেখানে। সূর্যমুখী গুলি সবচেয়ে সুন্দর । কেমন আকাশের দিকে মুখ করে অপেক্ষা করে থাকে কখন ময়ূখমালী সব ভুলে বুকে তুলে নেবেন তাকে।

আর ডালিয়া , গোলাপ এবং চন্দ্র মল্লিকার যে এত রূপ তা মাধবের কফি ব্লসমে না ঢুকলে কেউ জানতে পারবেন না । কফি ফুলও আছে তবে তা বিক্রির জন্য নয়।

সেগুলি খুবই ছোট ছোট একটি ডালে অনেকগুলি থাকে, সাদা রঙের ফুল আর একটা মৃদু সুবাস আছে তাতে। ঘন সবুজের কোলে সাদা সাদা ফুলের সমারোহ একটা অন্য আনন্দ আনে মনে । এখানে কয়েকটি কফি গাছ আছে। পর্যাপ্ত নয়।

## ৫

ব্লাডি হোর ! অস্ফুটে শুধু এই কথা দুটৈ বেরোলো ভেঙ্কির মুখ থেকে। ভেঙ্কি রিটায়ার্ড আমলা। উচ্চপদে কাজ করে অবসর নিয়ে এখানে আছেন । পুরো নাম ভেঙ্কটেশ বোনাপ্পা । থাকেন নিজের পৈত্রিক বাড়িতে। ওঁনারা কূর্গি।

ওঁনার অবসর বিনোদনের একটা উপায় নেট সার্ফ করা।

এরকম ভাবেই একদিন সার্ফ করতে করতে আলাপ মোনলিজার সঙ্গে। বয়সে সে যুবতী। প্রথমে স্যার বলতো তারপরে ভেঙ্কিই ওকে সহজ করে দেবার জন্য বলে – আমাকে তুমি নাম ধরেই ডেকো।

ভেঙ্কির স্ক্রীন নেম আনমোল । কাজেই এরপরে ওকে মোনালিজা আনমোল বলেই সম্বোধন করতো । অসম বয়সের বন্ধুত্ব ভালই চলছিলো । প্রথম ইন্ডিকেশন দিলো মোনালিজাই – আচ্ছা তুমি অমিতাভ আর জিয়া খানের ঐ ম্যাচিওর্ড লাভের সিনেমাটা দেখেছো ?

–কোনটা ? সরল মনেই বলেন ভেঙ্কি ওরফে আনমোল ।

–ঐ যে নিশবদ্ !

–হ্যাঁ দেখেছি কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগেনি ।

–কেন ? কেন ভালো লাগেনি ?

–ঐ বয়সের মেয়েকে ভালোলাগা আমার মতে বিকৃত মনের পরিচয় ।

–কিন্তু বিদেশে তো হয় !

বিদেশের কথা থাক ! ওদের সংস্কৃতি সম্পুর্ণ আলাদা । আমাদের এখানে সেক্সটা খুব গোপনীয় একটা ব্যাপার । বলেই একটু থমকে গেলো ভেঙ্কি ।

পরমূহুর্তেই নিজেকে সামলে নিলো সে ।

সেই মোনালিজাই বাড়তে বাড়তে এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে আজ ওয়েবক্যামে নিজেকে সম্পুর্ণ উন্মুক্ত করে দেখাতে চেয়েছিলো এবং সঙ্গে এটাও জুড়ে দেয় যে সে কিছু ওয়েবজিনে লেখে সেখানে ওয়েবক্যাম ব্যাবহার করে করে সুযোগ পেয়েছে ।

একটা সময় ছিলো যখন ভেঙ্কি নিজেও যেতো প্রস্টিটিউশনে । নিয়মিত যেতো । সে তখন মাস্টার্স করে ছোট ফার্মে চাকরি করতো , শহরে থাকতো এবং নিয়মিত যেতো বেশ্যালয়ে । বাড়ির কোনো দায় ছিলো না তাই যা মাইনে পেতো জমিয়ে দিতো ও ফুর্তি করতো । সেখানেই তার এক সন্তান হয় ।

সন্তানের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করে । কারণ সে দেহ ব্যবসায়ীর কোলের সন্তান ।

কিন্তু আজ এত বছর পরে সে জানতে পেরেছে যে সেই পুত্র সন্তান তার মতন দেখতে হয়েছে , হুবুহু একরকম শুধু তাই নয় সে খুবই কৃতী । খুব মেধাবী ও কবি হিসেবে বেশ নাম করেছে । তার লেখাপড়া হয়েছিলো বিদেশে । একটি এন জি ও-র মাধ্যমে সে বিদেশে যায় । পরে তার মাকেও নিয়ে যায় । এখন সে ইংলিশে লেখে ও কয়েকটি বইও বার হয়েছে নামী প্রকাশকের মাধ্যমে । এইসব কিছুই ভেঙ্কি পড়েছে খবরের কাগজে । যেই দেহপসারিনীকে সে অবহেলায় সন্তান সম্ভবা হবার পরে ফেলে এসেছিলো সে কিন্তু মিডিয়াতে একবারও ভেঙ্কির নাম উচ্চারণ করেনি ।

বলেছিলো -- এই সন্তান আমার ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসেবে আমিই এর বাবার কাছে চেয়েছিলাম ।

যদিও চিফ সেক্রেটারি হিসেবে ভেঙ্কির নাম সর্বজন বিদিত তবুও তাকে কিন্তু বাঁচিয়ে দিলো সেই মহিলা । ভেঙ্কি তার কাছে কৃতজ্ঞ সেই দিক দিয়ে ।

ছেলেকে সে দেখতে চায়না । আত্মগ্লানিতে । সে দূরেই থাক । থাক বেঁচে বর্তে দুধে ভাতে । নিজের কোনো দায়বদ্ধতা ছিলনা তাই আজ পুত্রের সাফল্যের ভাগীদারও সে হতে চায়না । আজ মোনালিজার সম্পর্কে ব্লাডি হোর শব্দটা মনে হওয়াতে নিজেকে কি সে ধিক্কার দিলো ? কে জানে !

কেমনতর মেয়ে সে যে নিজের দেহ নিরাবরণ করে ওয়েবক্যামে বসে বসে লোককে দেখায় ? বাড়িতে নিশ্চয়ই কেউ জানেনা ! একবার দেখতেও ইচ্ছে করছে ।

ছবি তো দেখেনি ডাইরেক্ট ওয়েব ক্যামে সম্পূর্ণটা দেখবার আহ্বান এসেছিলো বলে ভেঙ্কি এড়িয়ে গেছে।

ভেঙ্কি শুধু আমলা ছিলেন না ছিলেন একজন হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়নও।

মোনালিজা সামনে থাকলে এক পাঞ্চের ধাক্কায় নাক ফাটিয়ে দিতেন!

পাড়ার বক্সিং ক্লাবে প্রাথমিক শিক্ষা পাঞ্জাবী গুরু হিম্মত সিংয়ের কাছে।

হিম্মত বলেছিলেন : লড়ে যা পুত্তর তোর হবে।

খুব ট্যালেন্টেড বক্সার ছিলেন উনি। কিন্তু হলে কি হয় অলিম্পিকে গিয়ে একটাও মেডেল আনতে পারেননি। অবসর নেবার পরে ভেবেছিলেন একটা বক্সিং ক্লাব খুলবেন কিন্তু বিভিন্ন ঝামেলায় হয়ে ওঠেনি।

এখন তো চ্যাটিং আর সার্ফিং করেই কেটে যায় সময়। সকালে উঠে এক কাপ চা নিয়ে ইমেলে বসেন। তারপর ব্রেকাফাস্টের টেবিলে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প গুজব।

একমাত্র মেয়ে থাকে সুদূর ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে সে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে

পড়ে। তার নাম সৌন্দর্য্য। সুন্দরী, নির্মলা, স্বভাবও কোমলা।

মাঝে মাঝে আসে বাড়িতে। বাবা – মায়ের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফিরে যায় সে কলেজের হোস্টেলে। তারও আসবার সময় হল।

# ৬

কুর্গের শীতে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে বসে আছেন শকুন্তলা।

শকুন্তলা দেবী।

উনি গণৎকার নন তবে জিনিয়াস শকুন্তলা দেবীর মতন অঙ্কে পারদর্শিনী।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে জটিল ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারেন এবং রুবিক কিউব মাত্র ৫ মিনিটে সলভ করে ফেলেন। তবুও দুনিয়া ওঁনার নাম জানেনা কারণ উনি এক রক্ষণশীল দক্ষিণী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বাড়ির বাইরে বেশি যাতায়াতের পারমিশন ছিলনা। সময় মতন বিয়ে হয়ে যায় অন্য এক পরিবারে। ছেলেপুলে নেই। শ্বশুরের ভিটে সুবিশাল। একটা পার্ট দিয়েছে একটি রিসর্ট কোম্পানিকে। সেখানে তারা রিসর্ট করেছে অন্য পার্টে থাকেন একাকিনী , স্বামীহীনা শকুন্তলা দেবী।

সময় তার কাটে ধ্যান করে আর টুকটাক কাজ করে । মিস্টার যোসেফের বাড়ি যান । ওঁনার কফি প্ল্যান্টেশানের পাশে একটি কফি শপ আছে । সেখানে বাগানের কফি পান করেন পথচারী ও অন্যান্যরা । তার পাশে আছে যোসেফের ডিমের দোকান । দা এগ লজিক দোকানের নাম । সেখানে ডিমের বিভিন্ন পদ পাওয়া যায় । ডিমের যে এত রকমের ডিশ হয় চাঁদ আগে জানতো না । এখানে নিয়মিত সে আসে তখনই জেনেছে ।

একটু নমুনা দেওয়া যাক :

হাঙ্গেরিয়ান ওমলেট , আইরিশ ওমলেট এসব তো আছেই সঙ্গে ডিমের মধ্যে ফ্রাইড রাইস দেওয়া ওমলেট , এগ বিরিয়ানি , স্ক্রামবেল্ড্ এগ ইন করিয়েন্ডর কারি , সন ইন লওস্ এগ , সিলোন এগ কারি , কেষ্টো , মোটা স্পেশাল , এগ পাস্তার হাজারো ডিশ সেসব দেখে চমকে যাবার মতন । মণিপাল শহরে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিভিন্ন ডিমের ডিশ খাবার জন্য বিখ্যাত- কেষ্টো নামক ডিশখানি তো সেখান থেকেই এসেছে । সম্ভবত সন ইন লওস্ এগ ও মোটা স্পেশালও ।

তো যাইহোক সেই দুই শপে , কফি ও ডিম -হিসেবের কাজটা দেখেন শকুন্তলা দেবী । সময় কাটানোই যখন উদ্দেশ্য তখন হিসেবের পাশে পাশে উনি আড্ডাও দেন কর্মীদের সাথে । কফি বাগান পাহারা দেবার জন্য আছে পেল্লাই সাইজের গোটা ছয়েক কুকুর । তারাও শকুন্তলার দোস্ত । জীবনের অপরাহ্নে এসে উনি দেখেন যে মানুষের চেয়ে পশুরাই যেন বেশি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী ।

এই শকুন্তলা আবার লেখেন । বিভিন্ন কর্নাটকের পত্র পত্রিকায় ওঁনার লেখা বেরোয়ে মাঝে মাঝে । ওঁনার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ।

উনি যেই বিষয় নিয়ে লেখেন অনেক সময় দেখা যায় সেটা সত্যি ফলে যাচ্ছে।

যেমন একটি অঞ্চলে চিতা কোনোদিন অসেনি। গত ৫০ বছরে। অথচ উনি একটা ছোটগল্পে চিতার আগমণ নিয়ে লেখার পরেই সেই অঞ্চলে একদিন চিতা হানা দেয়। এছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে উনি লিখেছেন সেগুলি পরে দেখা গেছে যে কোন না কোনভাবে ফলে গেছে। তাই লোকে ওঁনাকে বলে ভবিষ্যত দ্রষ্টা লেখিকা।

লেখালেখি নিয়ে উনি খুব যে আগ্রহী তা নন। পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠান আর একটা ছোট গল্পের বই বার করেছেন এই পর্যন্তই ওঁনার আগ্রহ।

বেশি ভালোবাসেন অঙ্ক সমাধান করতে।

আনসলভড্ মিলেনিয়াম ম্যাথেমেটিক্যাল ইকুয়েশানগুলি করার চেষ্টা করেন।

উনি গিফটেড্ ম্যাথেমেটিশিয়ান।

তবে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে কূর্গি রান্না করে খাওয়াতেও খুব ভালোবাসেন।

পান্ডি কারি এঁনার কাছেই শিখেছিলো বঙ্গতনয়া চাঁদ।

১ কিলো পর্ক , ১ চা চামচ করে হলুদ, জিরে আর এক টেবিল চামচ লাল লঙ্কা বাটা , দুটো বড় পেঁয়াজ , ১৫ টা রসুনের কোয়া , ১ ইঞ্চি আদা , ১ চা চামচ সর্ষে আর ১ টেবিল চমচ গোটা জিরে , কনসন্ট্রেটেড তেঁতুলের রস ও আন্দাজ মতন নুন।

পর্ক অর্থাৎ শূকরের মাংস ভালো করে ধুয়ে ম্যারিনেট করো লাল লঙ্কা বাটা , হলুদ বাটা ও নুন দিয়ে আধ ঘন্টা।

এবার পেঁয়াজ , রসুন, আদা ও অল্প গোটা জিরে বেটে নাও । বাকি গোটা জিরে ও সর্ষে ভেজে নাও শুকনো খোলায় দেখো যেন পুড়ে না যায় । এবার তেলে ম্যারিনেটেড্ পর্ক দিয়ে ভাজো । সামান্য জল দাও। নুন টুন মিলিয়ে দাও । নাড়তে থাকো যতক্ষণ না শুকিয়ে যায় । পেঁয়াজের মিশ্রণটা দিয়ে কষো । গোটা জিরে ভাজা দিয়ে নাড়ো । শেষে তেঁতুল দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নাও । মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে নাও ।

খেতে অপুর্ব কিন্তু রেসিপিটা পেয়ে চাঁদ প্রথমেই ভেবেছিলো যে তেঁতুলটা বাদ দিয়ে দেবে । কিন্তু রান্নার সময় দেখলো যে ওটা না দিলেই নয় । তাই ও নিজের কেরামতি দেখাতে তেঁতুলের বদলে টমেটো পিউরি দিতো । খেতে ভালই হত । ওর কত বন্ধু ওর কাছ থেকে এটা শিখে নিয়েছে নেটে বসে ।

মাধবকেও ও একবার নেমতন্ন করে পান্ডি কারি খাইয়েছে নিজের হাতে রাঁধা ।

মাধব তো প্রশংসা করে বাঁচেনা ।

আহা ! পুনম তুমি যে এত ভালো শেফ তা তো জানতাম না ।

চাঁদকে সে পুনম বলে ডাকে । কারণ ওর মতে চাঁদ মানেই মনে হয় পুরুষ আর চাঁদ এমনিতে গোল আর এই চাঁদের মুখটা পান পাতার মতন । তাই ওকে চাঁদ না বলে চাঁদের মধুরিমা বলাটাই বেশি ভালো রোমান্টিক মনের মানুষ ফুল ব্যবসায়ী মাধবের কাছে । চাঁদ কিছু বলে নি । মেনে নিয়েছে । ও মাধবের পুনম ।

একদিন মাধব ওর লেগ পুলিং করছিলো ।

তোমার নামটা এত সুন্দর কিন্তু তুমি এত আন –রোমান্টিক কেন ?

কে বললো আমি আন –রোমান্টিক ?

আমি যতদিন তোমায় দেখছি তাতে রোমান্সের কোনো ছিটে ফোঁটাও তো চোখে পড়েনি আমার।

তাহলে কি করতে বলো আমাকে ?

প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দাও শুনেই চাঁদের মুখটা ঈষৎ লাল হয়ে যায়। বুকের ভেতরে মধ্য ৪০য়েও কাঁপুনি। দুরুদুরু। মাধবকে কি তাহলে ভালো লেগে গেলো ?

মাধব যেন নিজের মনেই গুন গুন করে বারবারা স্ট্রেই স্যান্ডের গান গাইতে গাইতে গেটের বাইরে চলে গেলো–

*ইউ ডোন্ট ব্রিং মি ফ্লাওয়ার্স , ইউ দোন্ট সিং মি লাভ সংস্ !*

যাবে কি চাঁদ একদিন একটি পুষ্পিত কফি পল্লব নিয়ে তার কাছে ?

# ৭

এক অরণ্য সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল যোসেফের বাড়িতে বসে। ভেঙ্কটেশ আর যোসেফ বেশ বন্ধু তো। কথা হচ্ছিলো বক্সিং নিয়ে। যোসেফ বলছিলেন যে তোমাদের দেশে এত ট্যালেন্ট থাকা সত্ত্বেও তোমার আন্তর্জাতিক মহলে কিছু করতে পারোনা কেন ?

তখন ভেঙ্কি একটি গল্প বলে। ধর্মেন্দ্রর একটা সিনেমা দেখেছে ভেঙ্কি। সেখানে লুকা গ্রাসিয়া বলে এক হেভি ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ছিল যাকে কেউ হারাতে পারতো না।

সে আমেরিকার লোক। নিগার। প্রথমে সবাই ভাবতো সে মহামানব কিন্তু পরে দেখা যায় সে চোরটামো করে জেতে। অর্থাৎ আহত প্রতিদন্দ্বীকে সে বিষাক্ত কিছু দিয়ে কাবু করে ফেলে। মারের চোটে যখন অপনেন্টের রক্ত ঝরে তখন লুকা ওর কোচের কাছ থেকে বিষ নিয়ে এসে গ্লাভসে করে বিপক্ষের এক্সপোজড্ জায়গায় লাগিয়ে দেয় তাতে সে বিষক্রিয়ায় নির্জীব হয়ে যায় তখন পিটিয়ে মেরে ফেলে লুকা খেলার ছলে।

এটা ধরা পড়ে ভারতীয় এক পাঞ্জাবী বক্সারের পুত্র সেখানে লুকার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে।

তোমরা সাহেবরা তো চোর্টার জাত ! মুখ ফসকে বলেই ম্যানেজ দেবার জন্য একগাল হেসে ওঠে। ভেবেছিলো যোসেফ রেগে যাবে। কিন্তু যোসেফ একেবারেই রাগলো না। সে খুব বিনয়ীর মতন বলে উঠলো : হ্যাঁ কিছু কিছু সাহেব ওরকম হয় বৈকি ! তবে লুকা গ্রাসিয়া তো নিগার , ডার্টি ব্ল্যাক নিগার ! ওগুলো কি মানুষের পর্যায় পড়ে ? দেখো ভেঙ্কি ব্যারাক ওবামার মা কিন্তু হোয়াইট সি ইজ নট ডার্ক স্কিনড্। অনেক সাহেবই আছে যারা খুব অ্যাকোমডেটিং। আমাকেই দেখোনা ! তোমাদের দেশে এসে আছি কিনা ?

ভালোবেসেই তো রয়েছি। আমার কত বন্ধু আছে তারা অ্যাফ্রিকায় গিয়ে থেকেছে , কাজ করেছে।

শুনে ভেঙ্কি মৃদু হাসে। বলে ওঠে : হ্যাঁ তোমাদের তো বেলজিয়ামে ওয়াইনের ব্যাবসা ছিল।

নো নো নট ওয়াইন ইটস্ বিয়ার , ফ্রান্সের কাছে যা ওয়াইন আমাদের কাছে তা বিয়ার। তোমরা ভারতীয়রা ওটাকে ওয়াইন বানিয়ে দিয়েছো। বলে মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটিয়ে তোলে যোসেফ সাহেব।

বাইরে হালকা ঠান্ডা বাতাস। অরণ্য রাজ্য কূর্গ। এখানে ঘন বনানী ব্যাতীত আছে পাগলা ঝোরা , পশুপাখ , কফি ক্ষেত ছাড়াও এলাচ , ভ্যনিলা ইত্যাদির বাগান। ধান ক্ষেতও আছে অনেক।

বাতাসে সবুজ গন্ধ। ওম ওম ঘরের ভেতরটা। বাইরে ঠান্ডা অল্প ঠান্ডা।

জঙ্গলের ঘোর লাগে যেন।

যোসেফ গলা পরিষ্কার করে জানতে চান ভেঙ্কি কফি পান করবে কিনা।

উনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। কফি নিয়ে আসে অশ্বিনী।

এক সময়ের নামী ও সুন্দরী খেলোয়াড় অশ্বিনী নাচাপ্পা তো এই কূর্গেরই মেয়ে।

কফি নিয়ে এলো যে সেই অশ্বিনীও কুর্গ সুন্দরী। গোধূম বর্ণা, পাতলা গড়ন, চোখা নাসিকা। কূর্গের এই কোদাওয়া প্রজাতি দক্ষিণের অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন। বহুকাল পুর্বে ওরা কোনো দূর দেশ থেকে হয়ত এসেছিলো কিন্তু এখন এখানেই অধিষ্ঠিত। ওদের নিজস্ব ভাষা হাল কোদাওয়া টাক। আর তাছাড়া ওরা কান্নাড়া ভাষায়ও কথোপকথন চালায়।

মূলত জমিদার কিংবা ক্ষেত খামারের মালিক ওরা। ওদের মূল ভাষা কোদাওয়া টাক তামিল, মালায়ালাম ও কান্নাড়ার মিশ্রণ বলে ভাষাবিদেরা মনে করেন। অনেক বিখ্যাত কোদাওয়ার মধ্যে আমরা চিনি ফ্যাশান গুরু প্রসাদ বিদাপা ও অ্যাথেলেট অশ্বিনী নাচাপ্পাকে। এছাড়া প্রথম আই এফ এস অফিসার একজন কোদাওয়া।

কফি পান করতে করতে যোসেফ বলে ওঠে : তোমাদের ইন্ডিয়াতে তো সাধু টাধু বলে যাদের দেখা যায় তারা সমাজের প্যারাসাইট। এইসব ভন্ডের কি প্রয়োজন সমাজে ? শুনেছি তলা কাবেরীতে এক তান্ত্রিক থাকেন উনি তো আবার ডাক্তার।

অর্থাৎ ভন্ডামির চূড়ান্ত। বুদ্ধির সঙ্গে ভন্ডামির মেল বন্ধন, দেখো কত সরল কোদাওয়া মানুষের সর্বনাশ করছে বাস্টার্ডটা বনে জঙ্গলে বসে বসে।

কথাগুলো ভেঙ্কির খুব একটা মনোপূত: না হলেও সে কিছু বলেনা।

এরপর থেকে যোসেফ মওকা পেলেই তান্ত্রিকের কথা টেনে ওকে ব্যঙ্গ করতো।

যোসেফের বাগানের পাশে বসার ঘরের সামনে বেশ কিছু কফি গাছ ছিলো তাতে একটা গাছে মোটেই ফুল হতনা। খুব রহস্যজনক গাছ ।

সেই গাছের একটা পাতা টেনে শুকতে শুকতে বাড়ি ফেরার পথে ভেঙ্কি ভাবছিলো যে আমরা যেমন সাহেবদের নিয়ে নানা চর্চা করি , ওরা বহুভোগ্যা , স্বার্থপর ইত্যাদি ওরাও সেরকম আমাদের মুণি ঋষিদের ভন্ড বলে গালাগাল দেয়।

ভারত সাপের আর ওঝার দেশ। এখানে হাই ক্লাস কিছু হতেই পারেনা।

এইসবই ওরাও ভাবে। কোনো তেমন ঋষিকে যদি দেখানো যেতো ব্যাটা সাহেবের বাচ্চাকে টাইট দেওয়া যেতো ! ওর এত সুন্দর ভেঙ্কি নামটা তো উচ্চারণ করতে পারেনা কেমন বিশ্রীভাবে দাঁত চেপে : ভ্যাংকি বলে বাঁদরের মতন মুখ ভ্যাঙ্চায় !

বিরক্তি লাগে। মনে হয় বলে দেয় : ওহে যুক্তিবাদী মহাপুরুষ আগে আমার নামটা সঠিক উচ্চারণ করো তারপরে আমার দেশের মুণি ঋষির কার্যকলাপ শিখবে।

ব্যাটা একদিন রামদেবের যোগ দেখছিল টিভিতে। ভেঙ্কি ভাবলো জিজ্ঞেস করবে : কি হে হঠাৎ কী মনে করে ? বিলেতি ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না বুঝি ?

তবে কিছু বলেনি।

আজকে সেটাভেবে নিজের মনে হেসে ওঠে ভেঙ্কি , ছেলেমানুষি ভাবনার জন্য।

# ৮

ইদানিং জঙ্গলে বাঘের আবির্ভাব হয়েছে । কোথার থেকে কেউ জানেনা । এখানে জঙ্গল তেমন ঘন নয় । বেশির ভাগই কফি ও ধান ক্ষেত কিংবা এলাচ ইত্যাদির বাগান । এটাকে গালগল্প ভেবে ফেললেও হবেনা কারণ অনেকেই বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে ও ডাক শুনেছে ।

দুটি ঘটনাও লোক মুখে ঘুরছে । টুরিস্টদের কথা । কেউ তলাকাবেরীর দিকে বেড়াতে যাবার সময় কোনো এক ঝর্ণার ধারে দেখেছে বাঘ বসে আছে । তার গর্জনে লোকটির ছোট মেয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলে । লোকটি খোলা জীপে ছিল তাই তাড়াতাড়ি উল্টো মুখ করে ফিরে আসে । আরেকজন সদলবলে যাচ্ছিলো পিকনিকে । সে মাঝপথে নেমে ছবি তুলছিলো । গ্রুপ ছবি । অটোমেটিক ক্যামেরা অন করে গাড়ির সামনে রেখে তুলতে গেছে ছবি । তোলা হলে গাড়িতে উঠে বসেছে ।

পরে দেখছে ছবিতে পেছনে একটা বাঘ দাঁড়িয়ে !

তখন ভয়ে ওদের শিঁড়দাড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় । জোর বাঁচা বেঁচে গেছে ওরা । তবে এইসবই লোক মুখে শোনা । সাক্ষাৎ বাঘের দেখা কেউ পায়নি যারা

এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ।

বব তো হ্যান্ডি ক্যামে ছোট ছোট ফিল্ম শুট করে করে নেটে পাবলিশ করে ।

ওর বাবা তো থাকেন চিকিৎসার জন্য শহরে । মাঝে মাঝে তাঁর কফির বাগানে এই বাসায় আসেন । বাগানটা এখন দেখে অন্য একজন । শুধু রেন্ট দেয় ববদের । তাই অমিত এখনে শহরেই থাকেন , ওঁনার স্বাস্থ্যও খারাপের দিকে , রোজ ইঞ্জেকশান নিতে হয় তাই এখানে থাকেন না ।

উনি নেটে বসে বসে পুত্রের ফিল্ম দেখেন ও তারিফ করেন ।

তবে পুত্র যে সমকামী সেটা হয়ত জানেন না ।

আর জানলেই বা কি ? উনি জীবনের এইসব বিষয়গুলো নিয়ে অত ভাবেন না ।

মেরিনের মানুষ হিসেবে সারা দুনিয়া ঘুরেছেন । বিভিন্ন রকমের লোক দেখেছেন স্বদেশে , বিদেশে ও সমুদ্রে । আজ জীবন সায়াহ্নে এসে ওঁনার মনে হয় মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে আর কিছুতে নয় , হওয়া উচিতও নয় ।

জীবনের এই অধ্যায়ে এসে মনে হয় কে কি জানে , বোঝে তার চেয়েও বেশি জরুরি কে কত বেশি আনন্দে আছে । কাজেই পুত্র সমকামী জানলেও ওঁনার জীবন দর্শনে বিশেষ হেলদোল হবেনা । যদি পুত্র তাতে আনন্দে থাকে । নিজের সন্তানের মতনই তাকে

মানুষ করেছেন। তাঁর ও অলিভিয়ার তো আর কোনো সন্তান হলনা। কিন্তু শেষে নিজের জন্ম রহস্য জানাতেই ববের কাল হল। তার আগে অবধি সবই ঠিক ছিলো। মেধাবী , ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করতো ভালো কোম্পানিতে।

কিন্তু নিজের মায়ের চিঠি পড়েই সব ঝামেলার শুরু। লোকে বলে ও চুরি করেছে। অমিত বিশ্বাস করেন না। তার ছেলে চুরি করতে পারেনা। নির্ঘাত কেউ তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আজকাল বদ লোকের তো অভাব নেই। বন্ধু সেজে এসে পেছন থেকে ছুরি। সেরকমই কেউ এটা করেছে হয়ত। ছেলে বলে সে চুরি করেনি।

তার ছেলে খুব সেন্সিটিভ। কী থেকে কী হয়ে গেলো ! ভাগ্যিস অলিভিয়া জীবিত নেই ! এইদিন তাকে দেখতে হয়নি।

রফিকের আজকাল এক অন্য নেশা হয়েছে। সে লোকাল খাবারের কম্পিটিশনে যায়। সেখানে গিয়ে সে কত খেতে পারে তার প্রমাণ দেয়। বেশ কিছু কম্পিটিশনে জিতেছে। ওর অসাধারণ খাবার ক্ষমতা দেখে কেউ কেউ ওকে পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক খাবার প্রতিযোগিতায় নাম দিতে। সেখানে জিতলে ওর ভালো এক্সপোজার হবে। আজকাল এই নিয়ে ববের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও হয়েছে। কারণ বিদেশে চলে গেলে বব একা হয়ে যাবো। ওদের নিয়মিত যৌন জীবনে তো বাধা পড়বেই উপরন্তু একজন কথা বলার লোকও থাকবে না কাছে।

অবশ্য ডাক্তার চাঁদ আছেন।

তবে চাঁদ চাঁদের জায়গায় আর রফিক তার নিজের জায়গায়।

বাঘের ডাক একদিন শুনলো বব। তখন ও ওর পার্টনার রফিকের সঙ্গে সেক্স করছিলো। রফিকের শরীরে নিজের শরীর লেপ্টে মুখ

থেকে একটা কিম্ভুব কিমাকার আওয়াজ করে নিজেকে তৃপ্ত করছিলো। চারপাশে অদ্ভুত নি:স্তব্ধতা।

রফিকের পায়ুতে নিজের পুরুষাঙ্গ ভরে রফিককে ও আরাম দিচ্ছিলো।

ঠিক একজন স্বামী ও স্ত্রী যেভাবে শারিরিক সঙ্গম করেন সেইরকম ।

এমন সময় হঠাৎ : হা লু ম !!!!!!!

চমকে উঠে ছিটকে যায় দূরে বব ও রফিক !

একেবারে ঘরের দুয়ারে বাঘের ডাক। গা হাত পা নিমেষেই হিম হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ওরা। তারপরে দেখতে ছোটে মূল ফটক বন্ধ আছে কিনা।

ববের পিতা অমিত আপাতত শহরেই থাকেন। ওদের কফি বাগান এখন রেন্ট দেওয়া হয়েছে একটি সংস্থাকে তারাই চাষ করে সেখানে ।

বব ও রফিক শোনার পরে খবর যায় চাকর নটরাজের কানে। তারপর চারিদিকে রটে যায় যে সত্যি বাঘ আছে এই এলাকায়। স্বয়ং বব ও রফিক তার সাক্ষী।

# ৯

শক্তিকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে সে বাঙালি। গায়ের রং ঘন কালো। মাথায় জটা হওয়া চুল। গড়ন গাট্টাগোট্টা। সে এই কুর্গে এসে বাসা বেঁধেছে আজ বেশ কয়েক বছর হল। সপ্তাহের ৬ দিন থাকে ব্যাঙ্গালোরে। একদিন এই কুর্গে।

শনিবার গভীর রাতে আসে সোমবার চলে যায়। এখানে সে একাই থাকে।

একটা দক্ষিণী বৌ ছিলো। সে মারা গেছে আন্ত্রিকে। তাও বেশ কয়েক বছর।

শক্তি যে প্রফেসর শ্রোত্রির বাড়ি যায় সেটা একমাত্র রবিবারেই। দিনের বেশির ভাগটা ওখানেই থাকে। সেখানে একটি ছেলেকে সে বেশ পছন্দ করে।

তার নাম আলি। সে হিন্দু হলেও তার নাম আলি। কারণটা আর কিছুই নয়। শৈশবে সে আয়ার কোলে মানুষ। আয়া ছিলো

মুসলিম। ওকে আলি বলে সম্বোধন করতো বলে বাড়ির লোকও ওকে আলি বলতো। ছেলেটির মা ছিলেন ডাক্তার।

ব্যস্ততার জন্য সে আয়ার কাছে বড় হয়েছিলো।

আলির পরে আমেরিকায় চলে যায়। সেখানে বেড়ে ওঠে। শেষে সে ইউ এস আর্মি জয়েন করে। বেশ কিছুদিন সেখানে সে কাজ করেছিলো। কিন্তু সমকামীতার জন্য ওখান থেকে সে পলায়ন করে। তিব্বত , চীন ঘুরে আসে ভারতে। ভারত তার খুব পছন্দ হয়ে যায়। এখানে কেউ একা নয়। চারপাশে কত মানুষ। সবাই সবার সঙ্গে উঠছে বসছে। আড্ডা দিচ্ছে। পথেঘাটে লোকে পায়ে হেঁটে চলে। মেলা, অনুষ্ঠান ,

বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আছে সবসময় সূর্য। প্রখর রৌদ্র। রৌদ্র ছায়ার খেলা। মানুষের মেলা। আলির বড় ভালো লাগে। এই প্রাণের টান বিদেশে নেই। ওখানে সব কিছুই পরিমিত। সুসজ্জিত। বড় গোছানো। আলি একবার তো কুম্ভমেলাতেও ঘুরে এলো। কত মানুষ সেখানে এসেছে। সে এক অন্য জগৎ। অন্য সুরে বাঁধা। কত সাধুর সঙ্গে আলাপ হল। একজনের ছবি তুলতে চাইলে উনি বাধা দিলেন। কিছুতেই বাবাজি ছবি তুলবেন না। শেষকালে একদিন আলি লুকিয়ে ওঁনার একটা ছবি নিলো। আড়াল থেকে।

তখন গোধূলি। সাধুবাবা সবে গাঁজায় একটান দিয়েছেন। এমন সময় ক্লিক ক্লিক করে উঠলো আলির ক্যামেরা। তখন ডিজিক্যাম বার হয়নি। সেটা ছিলো এমনি ক্যামেরার দিন। আলি মহানন্দে ছবি নিয়ে ফিরে আসে। বাবা জানতিও পারলেন না। পরে ছবি ওয়াশ করিয়ে দেখে যে একটাও ছবি ওঠেনি। পুরো কালো। অন্ধকার। হায় হায়!

মাঠে মারা গেলো সব। ছুট্টে গেলো সে সাধুর কাছে।

উনি প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বলে উঠলেন- তুকে তো আগেই বারণ করেছিলাম বেটা ! শুনিস- নি কি করা খামখা তোর রিল নষ্ট হল তো ?

আলি ওর পায়ে কেঁদে পড়লো- বাবা আমার একটা ছবি চাই চাই। আপনি মহাপুরুষ বাবা !

বাবাজিও হেসে চলেছেন। কিছুতেই মানবেন না , শেষে বললেন -- আচ্ছা তুই যখন এত করে ধরেছিস তখন আমি তুকে ছবি দেবো ।

আলির ক্যামেরা জ্বলে উঠলো । ছবি উঠলো বাবাজির । আলি কুম্ভমেলা প্রেমী হয়ে গেলো । সেই আলি এখন প্রফেসর শ্রোত্রির বাড়িতে আছে।

সে ওখানে ছাত্রদের পড়ায় বলে শক্তি শুনেছে । তারপরে ওর সঙ্গে কেমন একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে । শক্তি তো ব্যাঙ্গালোরে একটা ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত।

ব্যাবসাটা অদ্ভুত । ওরা রাস্তায় এক একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় । যেখানে ভালো স্পিডে গাড়ি আসে । তারপর কিছু ফুটপাথবাসীর বাচ্চা যা আগে থেকে ধার করে আনা তাদেরকে গাড়ির সামনে ছুঁড়ে দেয় । চলন্ত গাড়ি বেশির ভাগ সময়ই বাচ্চাটিকে আঘাত করে । ব্যাস্ ! জুটে যায় শক্তি দলবল নিয়ে । গাড়ির ড্রাইভারকে ঘেরাও করে শুরু হয় অত্যাচার , অর্থ দাবী করে ওরা।

তারপর মোটা অর্থ নিয়ে তবে ছাড়ে গাড়িওয়ালাকে।

শক্তি মোটামুটি এই ব্যবসা বেশ কিছু দিন ধরে করে। রবিবার রাস্তা ফাঁকা থাকে বলে বাড়ি চলে আসে।

ব্যাঙ্গালোর তো সাইবার শহর। ছোট্ট শহর। হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা আই টি ও বি পি ওর দৌলতে মেট্রো সিটি। এখানে এখন গাড়ির সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে লোকে কার পুলিং করছেন। তবুও রাস্তায় বহু গাড়ি আর শক্তির রমরমা।

ফুটবাসীরা বেশির ভাগই দরিদ্র , অনেকে মফ:স্বল থেকে এসেছে।

তারা তাদের সন্তানদের টাকার বিনিময়ে শক্তির গ্রুপকে ধার দেয়। ভালই ইনকাম হয় ওদের আর বাচ্চা বেশি জখম হলে কিংবা মারা গেলে আরো টাকা !

বাচ্চার তো কমতি নেই ওদের। বছর বছর বাচ্চা হয় ! কাজেই ওদের মূলধন করলে অসুবিধে নেই। দিব্যি চলে সবকিছু। শক্তির শক্তি , মানুষের অভক্তি।

কূর্গে। কুর্গে ও ডেরা বেঁধেছিলো বহুদিন আগে জায়গাটা ভালো লেগে যাওয়ায়। তখন সে ছিলো ভবঘুরে। আজ কূর্গই তার ঘর। পার্মানেন্ট ঘর।

এখানেই ভূত এখানেই ভবিষ্যৎ।

হ্যাঁ একবার ভূত দেখেছে সে এখানে। দেখেছে বৈকি। অনেক রাতে ফিরছিলো।

তখন শেষ বাসে আসতে হয় বলে অনেকদূরে বাসটা থেমে যেতো। বাকি পথ হেঁটে আসতে হত। ঘন জঙ্গল নাহলেও দুপাশে মোটামুটি ভালই জঙ্গল। ইউক্যালিপটাস্ , দেবদারু ইত্যাদি মহীরুহ। আছে

বুনো ফুলের গাছে , কাঁটাঝোপ । বাঁশবন । শক্তি চলেছে সুখেন দাসের ছবির গান গাইতে গাইতে ।

ওপারে থাকবো আমি , তুমি রইবে এপারে -

শুধু আমার দু চোখ ভরে দেখবো তোমারে -এ-এ-এ !!

-একটা সিগারেট দিবি ?

পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এলো নারী কণ্ঠ । চমকে ওঠে শক্তি ! এই জঙ্গলে এত রাতে বাঙালী মহিলা ? পেছন ঘুরে দেখে দক্ষিণী সাজে সজ্জিতা এক রমণী । রূপার গহনা পরা । চোখ দুটি জ্বলছে ওর । মুখে বাঁকা হাসি ।

-কি রে তুই কালা নাকি ?

থতমত খেয়ে যায় শক্তি ।

-ইয়ে মানে আ-আ আমি !

-নাস্তিক নাকি ?

-এ্যাঁ ?

-বলছি নাস্তিক নাকি ?

-হ্যাঁ মানে ,না ---

-কি হ্যাঁ মানে না ? যা হয় একটা ঠিক করে নিয়ে বল !

-মানি ভগবান মানি !

-আর ভূত ?

–না না ভূত টুত মানিনা !

–কেন রে ? ভগবান থাকলে ভূত থাকবে না কেন ?

–দেখ এই দেখ আমাকে ছুঁয়ে দেখ ।

তারপর শক্তি সত্যি কৌতুহল বশত: ছুঁয়ে দেখে মহিলার গায়ে রক্ত মাংস কিছুই নেই অর্থাৎ পুরো বায়বীয় দেহ । শক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় ।

সেই ভীতু অথবা প্রচন্ড সাহসী শক্তি রবিবার সারাদিন কাটায় প্রফেসর শ্রোত্রির বাসায় । নতুন সাহসে ভর করে সোমবার ভোরে চলে যায় ব্যাঙ্গালোরে , আরেক বিপজ্জক কাজ করতে ।

# ১০

মাধবের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করছে চাঁদ । দিন দিন এক অদেখা শক্তি যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাধবের পানে । চাঁদ ভাবে শেষপর্যন্ত প্রেমে হাবুডুবু খেতে হবে এই বয়সে । আজকাল ফাঁক পেলেই একা কয়েকবার ওর বাড়ি হানা দিয়েছে সে । ভালই কাটে সময় । গল্প গুজব করে , কফি খেয়ে , আড্ডা মেরে –

হোমিওপ্যাথির একটা বই মাধব ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়বে বলেছে ।

মাঝে কদিন মাধবের জ্বর হয়েছিলো তখন চাঁদ ওর সেবা করেছে হোমিওপ্যাথি দিয়ে । মাধবের উপহার একগুচ্ছ লাল গোলাপ । তাজা লাল গোলাপ ।

বিপদ যেন সময় বুঝেই আসে । মাধবের ফুলবন থেকে লাল গোলাপের তোড়া হাতে বেরোতেই ববের মুখোমুখি পড়ে যায় চাঁদ ।

–হাই !

–হাই ! কী খবর ? একটু আমতা আমতা করে বলে চাঁদ।

–খবর ভালই। তুমি মাধাবের সঙ্গে তাহলে লুকিয়ে প্রেম করছো ? দেখো আমি ধরে ফেলেছি !

–আরে নানা বব প্রেম বলছো কেন ? এটা স্রেফ বন্ধুত্ব !

–বন্ধুত্ব ? বলে একচোট হেসে নিলো বব। তারপর বললো – বন্ধু তো লাল গোলাপ দেয়না ! আর ইউ কিডিং ডার্লিং ?

–তুমি না বব একটা দুষ্টু ছেলে ! বলে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দেয় চাঁদ ওর মুখে।

–শুধু দুষ্টু ? বড় বড় চোখ করে বব – লোকে তো বলে আমি চোর ? বজ্জাত। ডিসওনেস্ট।

চাঁদ চুপ করে থাকে। একটু অসোয়াস্তি হল। একটু অকওয়ার্ড লাগছিলো।

ববই পরিস্থিতি হালকা করে দিলো -- ওকে চাঁদ পরে আবার দেখা হবে।

তুমি আর মাধাব দুজনে সুখি হও এই কামনা করি। চলি , বাই।

হন হন করে বব চলে গেলো। তার দীর্ঘ দেহ সবুজ গাছের আড়লে হারিয়ে গেলো।

চাঁদ লাল গোলাপের তোড়া হাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেও হাঁটা লাগায় বাড়ির পথে।

পথে দেখতে পায় বাঘের পায়ের ছাপ। আর বাঘের ডাক ও শুনতে পায়। ভয়ের চোটে লাফিয়ে সে পেছনে দৌড়ে চলে যায়। সোজা

মাধবের বাড়ির গেট খুলে এক লাফ দিয়ে ভেতরে তারপরে সোজা ওর ড্রয়িং রুমে। বিশাল ড্রয়িং রুম। কাঠের আসবাবপত্র সেখানে , বেশ কিছু এথনিক ফার্নিচার আছে। একপাশে ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি সেটা দিয়ে দোতলায় ওঠা যায়। বিভিন্ন অর্কিড সাজানো সেখানে। চাঁদ লম্ফ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাঘের গর্জন যেন আরো কাছে শোনা গেলো। ভয়ে ওর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

দরজা বন্ধ করে দিতেই পেছনে মাধবের মুখোমুখি। আবার গর্জন এবার খুব কাছে।

চাঁদ লেপটিয়ে যায় মাধবের লোমশ বুকের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ নাকি এক যুগ সে জানে না। ওর ভালোলাগছে , ভালোলাগছে ওর মাধবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। বাঘ আর ডাকছে না। হয়ত জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে। আজকে অসময়ে বাঘ না ডাকলে এই অফুরান মূহুর্তটা আসতো না কোনোদিন। মাধবও ওকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। ওর গায়ে একটা সুন্দর গন্ধ। খুব সুন্দর , কস্তুরি মৃগের মতন।

পুনম পুনম পুনম---অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ডাকটা। চাঁদ হারিয়ে যাচ্ছে মাধবের বুকে , ডুবে যাচ্ছে -- ওর পুরু ওষ্ঠ চাঁদের সারা শরীরে বুলিয়ে যাচ্ছে ও , চাঁদ নীরবে আদর টুকু চেটেপুটে খাচ্ছে। আস্তে আস্তে মাধবের মুখ নেমে যায় চাঁদের নাভিমূলের কাছে। খসে পড়ে আঁচল। আকাশে ততক্ষণে মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেছে চাঁদ। স্বভাবসুলভ নিয়মে নাকি লাজে বোঝা যায় না!

# ১১

তান্ত্রিক বাবা তলা কাবেরীতে থাকেন বটে তবে অনেক সময় কয়েক মাস উনি গৃহবন্দী হয়ে কাটান। গৃহ আর কি ? একফালি ঘর একটি। এক মিষ্টির দোকানের সংলগ্ন। বাবার পোষ্য এক ছাগল আছে। সেও ঐ কয়েক মাস ঘর থেকে বার হয়না। বাবা ধ্যানে থাকেন। ছাগলও। এই সময় কেউ এলে দেখা হয়না। তবুও যোসেফকে নিয়ে এই সময়ই এলো ভেঙ্কি। বাবার কাছে। যোসেফ তো হিন্দু সেন্টদের তুমুল গালাগালি করছিলো। তাদের ভন্ড ইত্যাদি বলে বিদ্রুপ করছিলো। কাজেই ভেঙ্কি স্থির করে যে কাছেই যখন এরকম এক মহাত্মা রয়েছেন তখন তাঁকেই যোসেফের সামনে প্রকাশ করা যাক। একদিন শুভলগ্ন দেখে তাকে নিয়ে এলো ভেঙ্কি বাবার কাছে।

বাবা গত দু সপ্তাহ বাড়ির বাইরে না বেরোলেও কি মনে করে যেন আজ হঠাৎ বেরোলেন। সঙ্গে সেই ছাগলটাও।

যোসেফের দল পৌঁছে গেছে। বাবা ওদের দেখে একমুখ হাসি হাসলেন।

হেসে বললেন – কী চাই তোমাদের ?

ভেঙ্কি এগিয়ে গিয়ে বললো – আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বাবা আবার হাসলেন। তারপর পা চালিয়ে একতা চাউনি দেওয়া চায়ের দোকানে ঢুকলেন। ততক্ষণে ওরা বাবার একদম কাছে এসে গেছে। বাবা মাটিতে শুয়ে যোসেফকে প্রণাম করলেন। যোসেফ একটু দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলো। পারলো না বাবা ওর পা চেপে ধরে প্রণাম করলেন। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন – বলো আমার কাছে আসবার হেতু।

গলা পরিষ্কার করে নিলো ভেঙ্কি। তারপর বললো : যোসেফের কিছু প্রশন আছে আধ্যাত্মবাদ নিয়ে। ওর ধারণা ভারতীয় ধর্ম গুরুরা সব এক একটা ভন্ড। তারা বনে বাদারে বসে তপস্যা করে, সমাজের কোনো কাজে লাগেনা। এরা সমাজের কাছে ম্যালিগনেন্ট টিউমার।

বাবা খুব হাসলেন। তারপর ওদের অবাক করে দিয়ে বললেন : ঠিকই তো বলেছেন, টিউমারই তো !

বাবার উত্তর শুনে বেশ ঘাবড়ে যায় ভেঙ্কি। বেশ আশা নিয়ে সে এসেছিলো যে যোসেফকে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের ওপরে কিছু জ্ঞান দেবেন বাবা তাতে ও ভবিষ্যতে এই জাতীয় উক্তি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু কৈ? বাবা তো দেখি ওর দলেই ভীড়ে গেলেন। অবাক কান্ড। পায়ের কাছে একটা নেড়ি কুকুর এসে বসেছে। যোসেফ ওকে আদর করতে লাগলো। বাবা ওকে বললেন – তোমার তো খুব পশুপ্রেম দেখছি। যোসেফ হেসে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ে।

এমন সময় কুকুরটা যোসেফকে ছেড়ে বাবার দিকে এগিয়ে আসে। বাবা ওকে আদর করে দেন। বোঝাই গেলো ও বাবাকে চেনে। এলাকার কুকুর। এবার হল এক মজা।

একটি বাঁদর দূরের একটা গাছের ওপরে ওর বাচ্চার সঙ্গে বসেছিলো। সে হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে এসে ওর বাচ্চাটিকে বাবার কোল তুলে দিলো। বাবা ওকে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আদর করলেন। তারপর বাঁদর ওকে নিয়ে চলে গেলো।

ভেঙ্কি হেসে বলে উঠলো - জানোয়াররা সচরাচর ওদের বাচ্চাকে এইভাবে মানুষের কাছে দেয় না। এ দেখছি অন্যধরণের বাঁদর। বাবার মাহাত্ম্য বুঝেছেন।

বাবা হেসে বললেন - মাহাত্ম্য বুঝেছে নাকি আমাকেই ওদের একজন ভাবছে কে জানে!

সবাই এই কথায় হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে চায়ের দোকানের ছোকরা দুই পেয়ালায় চা এনে যোসেফ আর ভেঙ্কি কে দেয়। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

বাবা বললেন - খেয়ে নাও। তোমরা আমার কাছে এসেছো বলে ও চা দিচ্ছে।

ওরা কথা না বাড়িয়ে চা-টা পান করলো।

কুকুরটা চলে গেছে দূরে। বাবা বললেন- চল আমার ঘরে গিয়ে কথা বলা যাক।

ঘরটা একটু দূরে। খুব সাধারণ একটা ঘর। বাইরে ক্যাটক্যাটে নীল রং করা।

সামনে একটা ছোট দোকান পেছনে বাবা থাকেন। উনি বললেন যে দোকানি ওঁনাকে এই ঘরে থাকতে অনুরোধ করেছে নাহলে উনি মন্দিরের চাতালেই রাত কাটাতেন।

মন্দিরটাও মাঝারি সাইজের। পাহাড়ের ওপরে। দোকানটা পাহাড়ের নিচের দিকে।

আরো দোকান আছে। বোঝা যায় ভক্তরা এখানে এসেই পুজোর উপাচার সংগ্রহ করে থাকেন। দোকানের পাশ দিয়ে এক ফালি সরু রাস্তা। সেটা দিয়ে গিয়েই দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকেই বাবার ঘর। কোনো আসবাব পত্র নেই। খালি একটি কুঁজো রাখা সঙ্গে একটি প্লাস্টিকের গেলাস। আর কোণায় মা কালীর একটি ছবি রাখা। একটা দড়ি ঝোলানো। তাতে কিছু কাপড় চোপড় রাখা। সবই অতি সাধারণ জিনিস।

বাবা একটা মাদুর নিয়ে এলেন দোকান থেকে। সেটা পেতে ওদের বসতে বললেন।

ওরা বসলো।

ঘরটা ছোট হলেও গুমোট নয়। একট বড় জানলা আছে সেটা খুলে দিতেই এক রাশ মিষ্টি রোদ্দুর এসে ঘরটা ভিজিয়ে দিলো। বাইরে একটা কাক অনবরত ডেকে চলেছে। ঘরের ছাদে বোধহয় লিকেজ আছে সেখান থেকে অল্প জল চুইয়ে পড়ে বৃষ্টি হলে বোঝা গেলো শ্যাওলা দেখে।

ভেঙ্কি বললো – আপনি এই ঘরেই মাসের পর মাস আবদ্ধ থাকেন ?

–হ্যাঁ।

–কী করেন ?

–ধ্যান।

–খিদে পায়না ?

–না। কোনো হুঁশই থাকেনা।

এবার যোসেফ বলে ওঠে – বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে না খেয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ?

না বাপু । আমি সাধারণ মানুষ তোমাদের বিজ্ঞান টিজ্ঞান অত বুঝিনা। আর না খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না। আমিই কি না খেয়ে থাকি তুমি ভেবেছো ?

যোসেফের এবার হাসার পালা। কেমন ধরেছে সে এই মহাপুরুষের জোচ্চুরি !

খাবার প্যাকেট নিয়ে ঢোকে ব্যাটা। নির্ঘাত শুকনো কিছু – তারপর দরজা বন্ধ করে খায়। লোকে ভাবে উনি না খেয়ে আছেন। কিন্তু একটা ছাগলও তো থাকে এখানে শুনেছে সে। সে কী খায় ? ওত ঘাস কি ঘরে জমিয়ে রাখা সম্ভব আর তা লোকের চোখের আড়ালে রাখা সম্ভব ? কেউ দেখলো না ?

যোসেফ জিজ্ঞেস করেই বসে।

প্রত্যুত্তরে বাবা খানিকক্ষণ নীরব থাকেন। তারপরে বলেন – বললে বিশ্বাস করবে ? আমি আর ও দুজনেই বাতাস খেয়ে থাকি।

তোমরা খাবার খেয়ে সেটার মেটাবলিজম করে এনার্জি গ্রহণ করো তো ? আমরা ডাইরেক্ট বাতাস থেকে ওর সমপরিমাণ এনার্জি শুষে নিতে পারি। আর তাছাড়া গভীর ধ্যানে গেলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও কমে যায়। শরীরের তেমন বোধ থাকেনা।

থাকেনা জ্বালা যন্ত্রণা।

যোসেফ এরকম যে শোনে নি তা নয়। কিন্তু এরকম করেন সেই ধরণের কোনো মানুষ সে আজ অবধি দেখেনি। এঁনাকে দেখে কিন্তু মনে হয়না যে ইনি মিথ্যে বলছেন। এঁনার একটি চুম্বকের মতন ব্যাক্তিত্ব আছে। এঁনাকে বিশ্বাস করতে সাধ হয়।

যোসেফ ওঁনাকে জিজ্ঞেস করলো যে উনি এত বায়োলজি শিখলেন কোথায়।

বাবা হেসে বললেন – এককালে বোকার মতন দুটো ডাক্তারি ডিগ্রী করতে গিয়েছিলাম ইংল্যান্ডে। আর দেখো আমার মতন মূর্খও দিব্যি ওতে পাশ করে গেলো। ছিলাম অনাথ। এক ধনী জমিদার ছিলেন এখনকার বাংলাদেশে। উনি আমাকে পুত্র হিসেবে পালন করেন। উনি নি:সন্তান ছিলেন না কিন্তু মানব দরদী ছিলেন। আজকাল যেমন বাংলা গল্পে কিংবা সিনেমায় দেখানো হয় জমিদার মানেই অত্যাচারী তা আসলে নয়। ইনি ছিলেন ভালো জমিদার। সেকালে তা আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে জমিদারের বাড়ি থেকে মানুষ বিলেতে পড়তে যেতেন। আমিও সেরকমই একজন। পরে ডাক্তারি করেছি। সাধনা করার পরেও আমি ডাক্তারি করেছি। অপারেশন করেছি। গত কয়েক বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল আর করিনা। একেবারে এখানেই স্থায়ীভাবে রয়েছি।

যোসেফ তাজ্জব। এরকম তান্ত্রিক সে আগে দেখেনি। শুনেছিল ইনি ডাক্তার কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। তার ধারণা ছিলো ইনি মুর্খ। জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। তার শেষ আশ্রয় ঈশ্বর নাম। কিন্তু এখন দেখছে যে তার ধারণা একেবারেই ভুল।

প্রতিষ্ঠিত , স্বচ্ছল , বিলেত ফেরৎ একজন ডাক্তার হঠাৎ এই ফিল্ডে কেন ?

আপনি হঠাৎ তন্ত্রে কেন ? আর তন্ত্র তো সেক্স শেখায় আপনি একা কেন ? আপনার যোগিনী কোথায় ?

বাবা একচোট হাসলেন । তারপর বললেন - অতশত খোঁজে কী হবে ? এত কথা তোমার আসছে পুঁথি পড়া বিদ্যে থেকে । ধ্যান করো দেখবে সব চরাই উৎরাই ভেঙে সমান হয়ে গেছে । সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো । যত জানবে তত কথা কমে আসবে । মন শান্ত হয়ে যাবে । তখন দেখবে না চাইতেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছো ।

আর তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র সবই একই পথে নিয়ে যায় । পরম সত্যকে জানা । বুঝলে হে !

যোসেফ কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছে ওঁনার কথা । কথা বলার ভঙ্গিমাটিও ভারি সুন্দর । আর সত্যি তো ওর মনে আর কোনো প্রশ্নই আসছে না । এঁনার সঙ্গ ওর ভালোলাগছে । এক পরম প্রশান্তি যেন ওকে ঘিরে ধরেছে তান্ত্রিক বাবার সান্নিধ্যে এসে । আর এরকম নির্মল তান্ত্রিকও যে হয় সে জীবনে শোনেনি । তান্ত্রিক মানেই তার কাছে একটি এনিগমা ছিল । এখন দেখছে তা নয় । ওর জানায় অনেক ফাঁক আছে ।

ওর বোধে অনেক শিথিলতা আছে । এই মানুষ নাকি মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা নাহলে সে জানতেই পারতো না যে ভন্ডামির বাইরেও আধ্যাত্মবাদ আছে ।

ওর দেখা এক পুরোহিত যিনি পরে সাধু হয়ে গেছিলেন উনি তো একবার এক জ্যান্ত ব্যাক্তির সৎকার করায় ব্রতী হয়েছিলেন । তখন পুরুতের পুত্র বাধা দেয় যে পুলিশ কেস হয়ে যাবে । ব্যক্তি আসলে কোমায় ছিলেন আর তাঁর সন্তানেরাও চাইছিলো যেন আর বেঁচে না ওঠেন । তবে ইনি যোসেফের দেখা এক ভিন্ন তান্ত্রিক ।

– কিন্তু তন্ত্রে তো সেক্সটা ইমপর্টেন্ট ।

একটা মানুষ কত খেতে পারে ? সেরকমই একটা মানুষ কত সেক্স করতে পারে ? একটা সময় বিরক্তি আসবে, মনোটনি আসবে । আর সেটা না এলে তাহল অসুস্থতা । তোমাদের ইকোনমিক্সে পড়ায় না ? কনজিউমাররা একটা সময় একই প্রোডাক্ট আর কিনতে চাইবে না । বিরক্ত হয়ে যাবেন । সেরকমই।

তুমি তো ব্যাবসাদার তাই না ? কফি চাষ করো ।

এবার অবাক হবার পালা যোসেফের । সে যে ব্যাবসা করে ইনি জানলেন কীভাবে ?

সে তো বলে নি ! ভেঙ্কিও তো বলে নি । যদি আগে কখনো বলে থাকে !

বাবা মনের কথা বুঝতে পারেন । বললেন– ভাবছো এই বুড়ো কী করে জানলো তাইনা ? আচ্ছা এত দুর থেকে এসেছো ! বলো কী দেখাবো তোমায় , বলো , বলো ! কি অত্যাশ্চর্য দেখতে চাও ? আগুন, ঝড়, জল নাকি শুষ্কতা?

আগুন ! মূহুর্তের মধ্যে কিছু না ভেবে বলে ওঠে যোসেফ ।

ওহ্ ! আগুন ! তবে দেখো । চল বাইরে চল ।

ওরা বেরিয়ে এলো ।

যোসেফ ও ভেঙ্কি দুজনেই দেখলো, একবার নয় বারবার , চোখ কচলে দেখলো যে দূরে একটা গাছ ছিল , মাঝারি মাপের বুনো গাছ তাতে হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো । সেই লেলিহান শিখা আকাশের দিকে মুখ করে উড়ে গেলো অচিন দেশে । বেশ কিছুক্ষণ জ্বললো আগুন । তারপরে বাবা বললেন – কি হল তো ?

সাধ মিটলো ? নাকি আরো পরীক্ষা নেবে ?

ওরা দুজনেই নির্বাক । তখন বাবা হেসে বললেন – নাও আরো একটা দেখা, এটা ফাউ ।

ওরা সবিস্ময়ে দেখলো আগুন নিভে গেছে আর গাছটা সম্পুর্ণ অক্ষত ।

উনি যোসেফকে উদ্দেশ্য করে বললেন -- জানো তো তুমি আর ঐ অগ্নি শিখার মধ্যে কোনো ভেদ নেই । ভেদাভেদ তোমার মনেই । তুমি বিশ্বাস করেই বসে আছো যে তুমি ঐ আগুনটা নও । তারপর প্রথাগত শিক্ষা শেখায় বিশ্বাস করতে যে তুমি ঐ আগুনটা হতেই পারো না । সেই শিক্ষা তোমায় আলাদা করে দেয় আগুনের থেকে কাজেই তুমি আমার মতন গাছে আগুন জ্বালাতে পারো না !

বলে মন্ত্রোচারণের মতন আওড়ে যান –

I am neither the mind nor the intellect

nor the ego nor the mind stuff

I am neither the body nor the changes of the body

I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight

nor am I the ether, the earth , the fire, the air

I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute ,

I am he I am he ( shivam shivam )

তারপরে বলেন- তোমরা যেই শিবের কথা বলো এই শিব সেই শিব নন। এই শিব হলেন পরম সত্য, স্বয়ম্ভু। সত্যম, শিবম, সুন্দরম। যেই শিব মানব সমাজকে যোগ শিখিয়েছেন ইনি সেই শিব অর্থাৎ মহেশ্বর নন।

শোনা যায় একটি খোঁড়া ভিখারী বাবাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতো। তার একটি পা ছিলনা। একদিন বাবা ওকে টেনে নিয়ে বললেন - এই তোর এত লাঠির ওপরে নির্ভরতা কেন ? ফেলে দে , ফেলে দে।

বলে যেই উনি লাঠি কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলেন লোকটি হাঁটতে শুরু করলো।

ওর পা খানি আর জখমি নেই। ভালো হয়ে গেছে।

যোসেফ বাবাকে জিজ্ঞেস করলো - কিন্তু আপনি আমাকে সেই হি অর্থাৎ ভগবানকে দেখাতে পারেন ?

নাহ্ ! আমি তোমায় আলো দেখাতে পারি। ভগবানকে জানতে হলে নিজেকে ভগবান হতে হবে কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। তার বাইরে যে জগৎ আছে তাকে জানতে গেলে তোমাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে হবে। তার জন্য চাই কঠোর সাধনা। তবেই তুমি নিজে ভগবান হতে পারবে। যেই আলো থেকে তোমার জন্ম সেই আলোয় মিশে যেতে পারবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরেও যে জগৎ আছে জানো তো ?

তোমাদের গ্র্যাভিটেশনকে তো দেখা যায় না। কিন্তু সে আছে বলেই তুমি পৃথিবীতে আছো। আর সাধুরা , সদগুরুরা হলেন এই ধরিত্রী যা কিনা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও তোমার মাঝে একটি ধাপ অর্থাৎ পৃথিবী

। তাঁরাই ধারণ করে আছেন সমাজ তুমি দেখতে পাও কিংবা না পাও ।

বাদুড়ের আল্ট্রা সাউন্ড ধরা আর হাতির সাব সনিক ওয়েভস্ ধরার কথা জানো নিশ্চয়ই ?

যোসেফ স্পেল বাউন্ড ! নিজেকে ভগবান করে ফেলা , আল্ট্রা সাউন্ড , সাব সোনিক---তার আর কিছুই জানার নেই । এতদিন ধরে পূর্বে আছে কিন্তু পুবের এমন সুন্দর রূপ আগে কখনো দেখেনি সে । পশ্চিমের মানুষের পক্ষে এ বোঝা ও আন্দাজ করা বড়ই শক্ত । যোসেফ আজ থেকে পশ্চিমের কর্ম সংস্কৃতি ও পুবের দর্শন ও অধ্যাত্মবাদের ছায়ায় বাঁচতে চায় ! সে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।

# ১২

শকুন্তলার ঘুমটা আজকে একটু দেরীতে ভাঙলো। একটু আলস্য লাগছে বিছানা ছেড়ে উঠতে। তবুও উঠলো সে। বাইরে পাখি ডাকছে। তার এই পুরনো বাড়িতে একটা পুরনো পুরনো গন্ধ থাকলেও গাছ গাছালি পাখ পাখালির গন্ধ ও কলতান বাড়িটাকে কেমন ছুঁয়ে আছে। ভালোলাগে। অদ্ভুত পাখি সেসব আরো অদ্ভুত তাদের ডাক ! একটি পাখির ঠোঁট এতই শক্ত যে কাঁচের জানালায় এসে ঠক ঠক করলে মনে হয় জানালা ভেঙে যাবে। কেউ খুব মিঠে সুরে গান করে। মনে হয় সুর দেওয়া কোনো গান। ইত্যাদি।

দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিয়ে আলতো করে কোলের ওপরে এসে পড়া একটা শুকনো পাতা সরিয়ে দিলো শকুন্তলা। কালকে কে যেন বলছিলো ঠাট্টা করে –

আপনি কূর্গে বসে কফি পান না করে সকালে দার্জিলিং চা পান করেন ? আর দার্জিলিং এ গেলে কী করবেন কফিপান ?

শকুন্তলাও হেসে উঠেছিলো হালকা রসিকতায় । এখন সেটা মনে পড়লো ।

শকুন্তলা একজন মানুষকে দেখেছেন যিনি মানসিক ভাবে সুস্থ হলেও চিবিয়ে চা খান । আর চায়ের মধ্যে কখনো কখনো পুরো পাউরুটি ডুবিয়ে দেন ও পাউরুটি পুরো চা সোক করে নিলে চামচ দিয়ে কেটে কেটে খান ! কত বিচিত্র রকমের মানুষ যে আছে জগতে । তবুও কী করে অনেক বলেন যে সব মানুষ এক ? নাহ্ শকুন্তলার মনে হয় এক নয় , বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে এক কিন্তু অন্তরে সব মানুষই ভিন্ন । দুনিয়ায় যত মানুষ তত ভিন্ন রকমের চরিত্র ।

এমন সময় বাইরের গেট খোলার আওয়াজ হল ।

চোখ তুলে চাইলো সে । অবাক কান্ড ! দুজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ এসে ঢুকছে বাড়ির মধ্যে । শকুন্তলা অবাক হয়েই উঠে গেলো । ওদের দিকে ।

একজন এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলো । বললো সে এলাকার সাব ইন্সপেক্টর ।

শকুন্তলাকে এক্ষুণি একবার থানায় যেতে হবে ।

কেন ? মৃদু ও অবাক স্বরে শুধান উনি ।

কারণ আপনার নতুন নভেলে যে লিখেছেন ব্যাঙ্গালোরের রেস কোর্সে অগ্নি কান্ডের কথা সেটা কাল রাতে ঘটেছে ।

শকুন্তলা এবার বুঝতে পারেন । আগেও দু একবার হয়েছে তবে পুলিশ বাড়িতে আসেনি কখনো ।

কিন্তু দেখুন অফিসার আমি এই কূর্গেই থাকি বাইরে যাইনা । ব্যাঙ্গালোরের ওটা সম্পুর্ণ আমার কল্পনা প্রসূত । এই ঘটনা সঙ্গে আমার কোনই যোগসাজস নেই । থাকতে পারে না । আপনারা খুব ভুল করছেন ।

ম্যাডাম আপনি প্লিজ একবার থানায় চলুন । ওখানে যা বলার বলবেন বড় সাহেবের কাছে । আমার ডিউটি আপনাকে থানায় পেশ করা আপনার অজুহাত শোনা নয় । সেটা বড় সাহেবের কাজ ।

শকুন্তলা আর কী বলেন । সোজা কথায় না গেলে মেয়ে পুলিশ দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে যাবে । কাজেই গিয়ে স্পষ্ট করে বলে আসাই ভালো যে সে যা লিখেছে তা কল্পনা ।

কল্পনা কি বাস্তবের সঙ্গে মেলে না ?

সে শুধু জিজ্ঞেস করলো যে খানিকক্ষণ সময় পাওয়া যাবে কিনা সে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নেবে ।

হ্যাঁ । আমি কন্সটেবেলকে রেখে গেলাম আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ওর সঙ্গে চলে আসুন । ওখানে কথা হবে ।

ইন্সপেক্টর চলে গেলেন । শকুন্তলাও সকালের সুস্বাদু চা খানা মাঠে মারা গেলো

বলে একটু দু:খ প্রকাশ করে তৈরি হয়ে নিতে গেলো । থানায় যেতে হবে ।

আগেও তো কয়েকবার হয়েছে এরকম তবে তার জন্যে থানায় যেতে হয়নি । শকুন্তলা যা লিখে দেয় অনেক সময় দেখা যায় তা ফলে গেছে । এবার খুব বড় ধরণের হল । যথাসময়ে থানায় প্রবেশ করলো । বড়বাবুর টেবিলে গেলো ।

পুলিশের ফুল ফর্মটা দেওয়ালে টাঙানো।

P--Polite
O--Obedient
L--Loyal
I--Intelligent
C--Compelling
E--Efficient

শকুন্তলা ভাবে এর একটাও কি আজকের পুলিশের জন্য প্রযোজ্য ?

এরা তো ঘুষখোরের জাত । অবশ্য মুম্বাই ব্লাস্টের পরে সব পুলিশকে দোষ দেওয়া যায়না। আর ও একবার ওদের কফি শপের এক কর্মীর কাছে শুনেছিলো যার বাবা ছিল পুলিশ কন্সটেবল যে তাদের মাইনেপত্র ভীষণ কম। খুবই অভাবের সঙ্গে তাদের সংসার চলতো। অনেকগুলো পেট অল্প টাকা।

কাজেই সেই কন্সটেবেল যদি ঘুষ নিতেনও তাকে কি দোষ দেওয়া যায় ?

যেমন ওদের কূর্গেই একটা চার্চের পাদ্রীকে পুড়িয়ে মারা হল । তারপর একদিন ক্ষিপ্ত জনতা চার্চেই আগুন জ্বালিয়ে দিলো পেট্রল দিয়ে। তখন ওদের এলাকার মাত্র অল্প সংখ্যক পুলিশ হোল নাইট ডিউটি দিয়েও মব কন্ট্রোলে আনতে না পেরে বড় শহর থেকে পুলিশ আনতে হল। তখন কানাঘুষোয় শুনেছিলো পুলিশের বিরক্তি ।

এত কম ফোর্স নিয়ে ওরা কাজ করতে অক্ষম। এক একজনকে বহু রাত্রি একটানা জাগরণ করে কাজ করতে হয়েছে ফলত চার্চ কন্ট্রোল করা সময় মতন হয়নি।

ওরা বিরক্ত বড় কর্তাদের ওপরে। তারা হুকুম দিয়েই খালাস ! আরে বাবা নিচুতলার পুলিশও তো মানুষ ! শকুন্তলা সেদিন নিজেকে নিচুতলার পুলিশ গৃহিনী না হবার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলো। নিজে নাহলেও ওর ঘনিষ্ঠ একজন একবার হ্যারাস হয়েছিলো পুলিশের হাতে।

ভদ্রলোক গুজরাটি । তামিল নাড়ুতে একবার হুসুর রোড দিয়ে যাবার সময় তার গাড়ি দূর্ঘটনা হয়। ভোর বেলা পন্ডিচেরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তারা ফুল স্পিডে যাচ্ছিলো । এমন সময় একটি ট্রাক ড্রাইভার রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে এক পা এগিয়ে আবার আরেক পা পিছিয়ে যাওয়াতে ওদের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

লোকটি পড়ে যায় পথমাঝে। ওরা ভেবেছিলো পালাবে কিন্তু গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন এমন বাজেভাবে ভেঙে যায় যে পালানো সম্ভব হয়না । ওদেরকে লোকাল লোক থানায় নিয়ে যায়। তারপর শুরু হয় জোর জুলুম । ওরা তামিল ভাষার কিছুই জানেনা । বলা কিংবা পড়া কিছুই তাদের নখদর্পণে নেই । অফিসার তামিল ভাষায় ডাইরি লিখিয়ে গান পয়েন্টে সই করিয়ে নেয়।

গাড়ি নিয়ে টানাটানি করতে গেলে ওরা গাড়ি রেখেই চলে আসে। পরে গাড়ির ইন্সুরেন্স কোম্পানি সেই গাড়ি রিকভার করে।

বেশ কিছুকাল পরে ওদেরকে ডেকে পাঠায় উকিল। অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার চার্জে।

ডাইরিতে লেখা হয়েছে : চালকের গাফিলতিতে এই দূর্ঘটনা।

ফুটপাথে গাড়ি উঠে গিয়ে এক নিরীহ ব্যাক্তিকে ধাক্কা মারে ও মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে কোন পূর্ব যোগাযোগ ছিল কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

গুজরাতি ব্যাক্তি অবাক হয়ে যায় । কারণ ঘটনা একেবারেই অন্যরকম।

উরে অনেক টাকা খসিয়ে তবেই রেহাই পান তারা। উপরন্তু ভালো ড্রাইভারটি পলায়ন করে ভয়ে। অল্পতে। বারংবার হর্ণ না শুনেও ট্রাক ড্রাইভারের আগুপিছু তে যেই দূর্ঘটনা তার দায় পুরো চাপিয়ে দেওয়া হল গুজরাটি ব্যাক্তির ঘাড়ে।

অদ্ভুত দেশ এই ভারত বর্ষ । যেন জোর যার মুলুক তার । তামিলিয়ানরা রেসিস্ট উনি শুনেছিলেন ওরা নর্থ ইন্ডিয়ানদের বেশি পাত্তা দেয়না কিন্তু এরকম জানতেন না। আর পন্ডিচেরিতে গিয়েও তো দেখলেন ! পুরো অরবিন্দ আশ্রমের দখল ফরাসীদের হস্তে। ভারতীয় আছে তবে খুব কম ! সেকুলার দেশে নিজেকে কি ভারতীয় বলে গলা বাজিয়ে পরিচয় দিতে পারবেন উনি ? এই দুটি অভিজ্ঞতার পরেও ? প্রশ্নটা করেছিলেন শকুন্তলাকেই !

বড় সাহেব এবার ফাইল থেকে মুখ তুলে জানতে চাইলেন : বলুন শকুন্তলাজি আপনি এইসব ঘটনার সঙ্গে কবে থেকে জড়িত !

শকুন্তলা অত্যন্ত বিনীতভাবে তার বক্তব্য পেশ করলো । যে সে এগুলো কিছুই জানেনা , রচনাগুলি নিতান্তই তার কল্পনা।

তখন অফিসার গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার কি প্রিমোনিশন হয় ?

নাহ্ ! শকুন্তলার সাফ জবাব।

আসলে আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক সময় আমরা এদের সাহায্য নিয়ে থাকি কিনা ক্রিমিন্যাল ধরার জন্যে তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বলুন শকুন্তলাজি আপনি এই ঘটনা গুলি তাহলে আগে থেকেই জেনে যাচ্ছেন কীভাবে ? আপনার লেখায় কী করে এগুলো ফুটে উঠছে ? আপনি নির্দোষ তার প্রমাণ কী ?

শকুন্তলা বললো -- দেখুন আমার প্রি মনোনিশন নাহলেও স্পেশাল ক্ষমতা তো কিছু আছে । আমি অঙ্ক বিশারদ । আপনি আমাকে একটা বিরাট ক্যালকুলেশান দিন আমি নিমেষেই করে দেবো । মুখে মুখে । তাই আমার হয়ত এই কল্পনা শক্তিও বিশেষ ধরণের । আপনি পরীক্ষা নিয়েই দেখুন না !

পুলিশ অফিসার আর্টস্ পড়ুয়া মানুষ । ভূগোলে নাহলেও চিরকালই অঙ্কে গোল ।

তাই মান বাঁচাতে ডাকলেন অন্য এক ছেলেকে । সে ওদের ইনফর্মার ।

ছেলেটি সাধারণ ছেলে হলেও অঙ্কের মাথা ও অ্যানালিটিক্যাল ব্রেন অসাধারণ ওর ।

গরীব ঘরের ছেলে । জাতে তিব্বতী । তিব্বতের বিশাল সেটেলমেন্ট আছে কূর্গে । কুশলনগরে । বিরাট মনাস্ট্রি আছে সেখানে । বলা হয় এশিয়ার দ্বিতীয় বড় সেটেলমেন্ট ওটি । ছেলেটি ওখান থেকেই এসেছে । নাক চাপা , চোখ ছোট এক হলদেটে যুবক । আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ । মুখটা অসম্ভব করুণ ।

কুশলনগরে গেলে মনেই হয়না যে কেউ দক্ষিণে আছেন । মনে হয় এও এক দার্জিলিং । পাহাড় তো আছেই সঙ্গে চোখ ছোট মানুষ । সরল মানুষ আর মনাস্ট্রি ।

দ্বিতীয় দার্জিলিং ।

শকুন্তলা গেছে সেই মনাস্ট্রিতে একাধিক বার। খুব সুন্দর। গোল্ডেন টেমপেল আছে সেখানে। প্রচুর জরাজীর্ণ লামা ও তাঁদের অদ্ভুত শক্তি দেখেছে সে।

কেউ ধ্যানের সময় ওপরে উঠে যান। নিচে মোটা গদি পাতা থাকে যাতে তার ওপরে পড়েন ধ্যান ভাঙলে। কেউ দুরের জিনিস দেখতে পান।

তিব্বত , এক মেয়ে ঢাকা আশ্চর্য দেশ !

শুনেছে শকুন্তলা যে ওখানে এমন সমস্ত জিনিস আছে যা শুনলে আধুনিক বিজ্ঞান চমকে উঠবে ! তিব্বতীরা যারা কূর্গের ওখানে থাকে তাদের প্রধান জীবিকা হল চাষবাষ , কার্পেট বুনুন , ধূপ তৈরি ও নানান হস্তশিল্পের কাজ। সেইসব বিক্রী করে তাদের চলে।

কিছুদিন মুম্বাইতে ছিলেন এমন সময় একদিন ওর এক চীনা বান্ধবী দলাই লামার একটা পোস্টার দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলে পদদলিত করছিলো।

শকুন্তল অবাক হয়ে গেলে চীনা মেয়েটি বলে যে : এ ভীষণ বাজে লোক !

শকুন্তলা বলএন : কে বলেছে বাজে লোক ? তোমাদের চৈনিক সরকার ?

তোমাদের দেশের মধ্যেই বেজিং এ যেতে গেলে ভিসা লাগে কেন গো ?

তোমাদের তিয়েমিয়ন স্কোয়ারে ঐভাবে ছাত্রদের ওপরে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিলো কেন সরকার ? ছাত্ররাই তো তোমাদের জাতির ভবিষ্যৎ !

মহিলা কিছু বলেনি। শুধু দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো অঝোর ধারায় !

তিব্বতীদের অত্যাচারের গল্প কোন নতুন জিনিস নয় শকুন্তলার কাছে।

এই ইনফর্মার তিব্বতী ছেলেটি শকুন্তলাকে কে একটি বড় যোগ করতে দিলেন। শকুন্তলার নিমেষেই করে দিলেন। তারপর গুণ, তারপর ভাগ তারপরে আরো নানান পরীক্ষা নিয়ে এই সিধান্তে উপনীত হলেন যে শকুন্তলার সত্যি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। পুলিশ অফিসার বললেন : আপনাকে আমরা অবসার্ভেশানে রাখবো। যদি কিছু সন্দেহজনক না দেখি তখন আপনি মুক্তি পাবেন। আপনার কথা আমরা মেনে নেবো যে ঘটনাগুলি নিছকই আপনার কল্পনা।

এরপরে শকুন্তলার রাজি হওয়া আর না হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। মেনে নিতেই হবে। তার কেসটা খুবই রহস্যময় তাই এইটুকু মেনে নিতে হবেই প্রমাণ দেবার আগে। শকুন্তলা ধীর পায়ে ফিরে এলো বাসায়। আজ আর কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না। বিকেলে ওদের কফি শপের এক কর্মীর মেয়ের বিয়েতে যেতে হবে। সেখানে যাবেই। অনেকে বলেন কূর্গের খাবার দাবার ব্যাতীত সবই বেশ ভালো।

এমন কি বিয়ের রীতিনীতিও।

এখানে ছোট ছোট জঙ্গল বাঁচিয়ে রাখার এক সুন্দর নিয়ম আছে। সেই জঙ্গলগুলিকে বলা হয় দেবারুকাড়ু। সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো হয় এবং গাছ ইত্যাদি কাটা বারণ। এইভাবেই কূর্গীরা বন সংরক্ষণ করে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা জাত বনজ। বনমাতাল। পশ্চিমঘাট পর্বতের এই পাহাড়িয়া অঞ্চল সত্যি এক মনোরম ও শান্তিপ্রিয় স্থান বলে চিহ্নিত।

তলাকাবেরীর দিকেই পড়ে ভাগমন্ডলা। সেটি পুণ্য ত্রিবেণী সঙ্গম।

কাবেরী, কন্নিকে আর অন্ত:সলিলা নদী সুজ্যোতি এখানে মিলেছে। এখানে শ্রাদ্ধের কাজ করা হয়। তিনটি নদী খুব সরু হয়ে এখানে মিলেছে। এখানে পুজো দিয়েই তীর্থযাত্রীরা তলাকাবেরীর দিকে চলে যান। অনেকেই এখানে মুন্ডিত মস্তকও হন।

শকুন্তলা মাঝে মাঝে ওখানে যান পুণ্য স্নান করতে।

বেশ ফ্রেস হয়ে আবার ফেরেন নিত্য দিনের জীবনে। পুলিশের ঝামেলাটা চুকে গেলে একবার যাবেন।

সন্ধ্যায় সেজে গুজে গেলেন বিয়ে বাড়িতে। চেনা লোকের বিয়ে তাই অনেকেই আগে থেকে চেনা। কোদাওয়া বিয়ে হয় খুব সামান্য নিয়ম মেনে। এই সমস্ত বিয়ে বেশ জাঁক জমক পূর্ণ ও সুন্দর। পূর্বপুরুষদের জন্য প্রার্থনা ও বড়দের শুভেচ্ছাই সম্বল। কোনো পণের ব্যাপার নেই। কোদাওয়ারা হিন্দু হলেও এই বিয়েতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয়না। মাকে ওরা খুব গুরুত্ব দেয় বিয়েতে। মা বিধবা হলেও ওঁনার বিয়ের আসরে ভূমিকা থাকে, ওঁনাকে অস্পৃশ্য করে রখা হয়না, সসম্মানে বিয়ের আসরে আনা হয়। মা জীবিত না থাকলে মামা বাড়ির লোকেরা বিশেষ ভূমিকা নেন ও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পুরো বিয়ের মূল কথাই হল পরস্পরের গুরুজনের সম্মিলিত আশীর্বাদ।

আগে হয়ত আলাদাভাবে বর ও কনের বাড়ি বিয়ের আসর বসতো কিন্তু এখন একটি কমন জায়গায় বিয়ে হয় যাকে বলা হয় দম্পতি মুহুর্ত।

শকুন্তলা বিয়ের আসরের হৈ হল্লা থেকে একটু আগেই বেরিয়ে গেলেন। কারণ মনটা খুঁত খুঁত করছিলো। পুলিশের ঝামেলাটা না থাকলেই চলতো!

লাল শাড়ি পরিহিত কনেকে বড্ড মিষ্টি লাগছিলো আজ।

অনেক মুখোরোচক খাবার খাওয়া হল।

বরফি, মাটন পেপার কারি, ব্যাম্বু শুট কারি, তেতো কমলার রায়তা, পাপুটু ( স্টিমড্ রাইস কেক ) কোদাওয়া পান্ডি কারি ( শূকরের মাংস) , কূর্গ ম্যাঙ্গো কারি , চালের হালুয়া আরো কত কি ! সে এক মহাভোজ।

ফেরার সময় ওদের এক কলিগ লিফট দিলেন গাড়িতে। উনিও সপরিবারে ফিরছিলেন। হঠাৎ ড্রেন শকুন্তলার মনে হল এই বিয়ের পাত্রটি খুব সুখী হবেনা।

যেন ঘোর এক অমাবস্যার ছায়া ঘিরে ধরেছে তাকে। কূর্গে যেন কী একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সবাই হাসছে , আনন্দ করছে , বিয়ের গল্পে মেতে আছে কিন্তু মন ভার কেবল শকুন্তলার। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুকে কম্পন। পরমূহুর্তেই মনে হচ্ছে যে এ তার কল্পনা। এক অত্যাশ্চার্য কল্পনা যা তাঁকে আজ পুলিশ স্টেশানে টেনে নিয়ে গেছে।

এই কূর্গেই এক রাজকন্যার গদমাদার ছিলেন রাণী ভিক্টোরিয়া। চিক্কা বীররাজেন্দ্র নামক কূর্গের শেষ রাজার কন্যা গৌরাম্মা ১৮৫২ তে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। বীররাজেন্দ্রই প্রথম ভারতীয় রাজা যিনি ইংল্যান্ডে ভেসে যান। গৌরাম্মার গডমাদার রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ব্যাপটিজমের সময় উপস্থিত ছিলেন । এই ব্যাপটিজম হয়েছিলো ৩০শে জুন ১৮৫২ তে । তখন রাজকন্যার নাম হয় ভিক্টোরিয়া গৌরাম্মা।

পরে মহারাণী রাজকন্যা ও মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এর পুত্র দলীপ সিং এর বিবাহ দিতে উৎসুক হন কিন্তু ঐ রাজ পরিবার রাজি হননি।

পরে ১৮ বছরের রাজকন্যা ৪৮ বছরের এক বিপত্নীক জন ক্যাম্পবেলকে বিবাহ করেন। তাদের একটি কন্যা ছিল। কূর্গে বহু রাজা রাজত্ব করেছেন। কূর্গের ইতিহাসে তা এক মোহময় অধ্যায় – –এইসব গল্প বলে চলেছেন এক ব্যাক্তি শকুন্তলার পাশেই। বৃদ্ধ ব্যাক্তি। যাকে ব্যক্ত করছেন মনে হয় উনি এন আর আই। অন্য সময় হলে শকুন্তলা ধৈর্য্য ধরে শুনতেন কিন্তু এখন মনটা বড় বিক্ষিপ্ত।

# ১৩

চাঁদের ঠোঁটে চুম্বন। হালকা চুম্বন এঁকে দিলো মাধব। এই কদিনে ওরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। একটি বাঘের গর্জন কত কিছু পাল্টে দিতে পারে।

আজকাল নিয়মিত ওরা দেখা করে। গল্প গুজব করে।

সময় কাটায়। প্ল্যাটনিক লাভ এই বয়সে চাঁদের কাম্য হলেও হয়ত মাধবের কাম্য নয়। কাজেই সে চাঁদকে ছুঁয়ে দেখতে চায়। প্রভোকেটিভ কথাবার্তা বলে।

খোঁপায় ফুল লাগিয়ে দেয়। কবিতা লিখে উপহার দেয়।

একদিন ওরা ববের আর রফিকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছিলো।

মাধব বললো : দেখো আমাদের সমাজ খুব রিজিড। কেউ যদি নিজের সেক্সুয়াল লাইফ বেছে নেয় ও অন্যদের বিরক্ত না করে

তাহলে দোষটা কোথায় ? আমরা অযথা লোকের ব্যাক্তিগত জীবনে নাক গলাতে আরম্ভ করি , তাই না ? নিজেদের হাজার দোষ ঢেকে অন্যের দোষ খুঁজতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ি । কি বলো ?

মৃদু হেসে সম্মতি জানায় চাঁদ ।

চাঁদের ববকে খারাপ লাগেনা । ও তার বন্ধু কাজেই একটু আশকারার সুরেই বলে ওঠে : হ্যাঁ যা বলেছো , সত্যি দোষের আমিও কিছু দেখিনা !

একদিন ওরা একসঙ্গে ডে লং পিকনিকে কাবেরী নিসর্গ ধামে বেড়াতে গেলো ।

সারাটা দিন ঘন বাঁশ বনে কাটালো । ট্রি হাউজ , কাফেটেরিয়া , উদ্দাম নদী , ঝুলন্ত সেতু সব নিয়ে বেশ কেটে গেলো সারাটা বেলা ।

হাতির পিঠে চড়লো ওরা । সেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবেই মাধবকে জাপটে ধরে বসেছিলো চাঁদ । একটি বাচ্চা ছেলে নামার সময় – কেমন লাগলো আন্টি ?

বলাতে চাঁদ যেন আবার ফিরে এলো বাস্তবে । তার আগে পর্যন্ত সবটাই স্বপ্ন ।

মনে পড়ে যায় ববের জিজ্ঞাস্য : ডু ইউ লাভ মাধাভ ?

এই একসঙ্গে সময় কাটানো , এই নিবিড় মূহুর্ত যাপন এ কি ভালোবাসা নয় ??

আগেও সে সেক্স করেছে কিন্তু মনে হয় মাধবের সঙ্গে আরো আগে দেখা হলেই ভালো হত । কেন জীবনে অনেক কিছুই এত দেরি করে

হয় ? কেন ? অনেক যোগাযোগ , অনেক চেনা পরিচয় ? তখন ভুলের মাশুল গোনা ছাড়া আর কিছুই থাকেনা।

মাধবকে সে তো নিজের সবটা দিতে পারবে না । কারণ আগেই কিছুটা তার হারিয়ে গেছে । কোনো এক উদ্দাম মুহূর্তে । সে তো ভার্জিন নয় !

অবশ্য মাধবের এইসব নিয়ে কোনো ছুৎমার্গ নেই । সে খুব বাস্তববাদী এদিক দিয়ে।

তারপরে ওরা গেলো দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। এটি হাতিদের ট্রেনিং দেবার ক্যাম্প। ঘন বন থেকে জংলী হাতি ধরে এনে এখানে রেখে ট্রেন করা হয় । তারপর তাকে দিয়ে কাজ করানো হয় কিংবা টুরিস্টদের ভজনা। মাধব মজা করে বললো : দেখো এই ক্যাম্প তুমি একবারে দেখে শেষ করতে পারবে না। আরেক দিন আসতে হবে।

চাঁদ বলে- কেন ? ক্যাম্পটা তো খুবই ছোট।

আরে ওরাই তো বলছে যে একবারে হবেনা !

কে বলছে ?

কেন ক্যাম্পের লোকেরা।

কখন বললো ? আমি শুনিনি তো !

পুনম তোমার অবসার্ভেশন পাওয়ার দিন দিন কমে যাচ্ছে। কী করে রুগী সামলাও কে জানে ! উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে করে দাও না তো ?

চাঁদ নীরব দেখে মাধব বলে ওঠে : আরে বাবা এই ক্যাম্পের নামই তো দুবারে। অর্থাৎ একবারে কিছুই দেখা হবেনা !

রসিকতায় দুজনেই হেসে ফেলে।

একটা নদী আছে, অল্প জল, হয়ত কোমড় পর্যন্ত । লোকে বলে কাবেরী।

সেই নদী হেঁটে পার হয়ে কিংবা বোটে করে পার হয়ে অন্যধারে যেতে হয়।

সেখানে পাল পাল হাতি রয়েছে। একটা দিকে বড় বড় কাঠের লগ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক্যাম্প। সেখানে সদ্য জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে হাতিদের রাখা হয়েছে । তাদের ওখানে ট্রেন করা হয় । তারা খুব রাগী। মাঝে মাঝে অন্য হাতিদের এনে যারা অলরেডি সভ্য হয়ে উঠেছে ঐ বুনোদের বাগে আনার চেষ্টা করা হয় । অন্যপাশে মোটামুটি সভ্য হাতিরা টুরিস্টদের দেওয়া ছোলা খায় , শাকপাতা খায়। নদীতে ওরা স্নান করে তখন টুরিস্টরা তাদের গায়ে ছোবড়া ঘষে ঘষে তাদের স্নান করাতে পারে।

হাতির দল মহানন্দে সেই স্নান উপভোগ করে। চাঁদ যাবার সময় বোটে গেলো ফেরার সময় একটু দুর দিয়ে যেখানে জল কম হেঁটে ফিরলো। বোটে ওঠার সময় প্রায় মাধবের কোলে উঠে পড়ছিলো। এবং দেখলো আজ এত বসন্ত পড়েও তার অন্তরে একটা শিরশিরানি দেখা দিলো। ফেরার সময় জলের তোড়ে কাপড় ভিজে গেলো।

ওর ভেজা শরীরের দিকে চেয়ে মাধব অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো।

সারাটা সময় চাঁদ ও মাধব সেখানে কাটালো । ঘুরে দেখলো , হাতিকে ছোবরা ঘষে স্নান করালো। মত্ত হাতি পদ্ম বনে শুয়ে আছে।

অর্থাৎ স্বল্প জলে কোনক্রমে গা ভিজিয়ে শুয়ে আছে বাধ্য খোকার মতন।

মাধব বল্লো : এমনি করে আমিও একদিন তোমাকে স্নান করানোর স্বপ্ন দেখি। আমার বাড়ি বাথটবে আমি তোমাকে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ঘষে ঘষে সিনান করাবো। তোমার নরম শরীরে আমার পুরুশালি হাত খেলা করবে।

চাঁদ লাজে রাঙা কনে বৌয়ের মতন।

বৃংহন শুনে বুনো হাতির পালের কাছে ( যাদের ধরে আনা হয়েছে সদ্য) গেলো। এক একটা হাতির সে কি দাপট ! তারা লগ কেবিন ভেঙে বেরিয়ে পড়লো বলে ! বাঘের ডাকের মতন বৃংহণ শুনেও চাঁদ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো তবে লোকসমক্ষে আর মাধবের বুকে মুখ লুকানো হয়নি !

একদিন মাধবকে বলেছিলো চাঁদ , আমরা বিজ্ঞানের লোকেরা তো আঁতেল নই তোমরা কবিরা আঁতেল হও কেন ? উত্তরে মাধব একটু হেসেছিলো। তারপর বলেছিলো , সব কবি আঁতেল হননা। সিউডো ইন্টেলেকচুয়ালদের আঁতেল বলা হয়। আর বিজ্ঞানে তো সব সাদা আর কালো। তাই আঁতলামি নেই। তুমি কি রেজাল্ট পেয়েছো সেটাই দেখা হয়। পজিটিভ নয়ত নেগেটিভ। কিন্তু ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে গ্রে এরিয়া বেশি তাই সিউডো ইন্টেলেকচুয়ালের সংখ্যাও বেশি। বলেই একটা কফিফুল তুলে ওকে উপহার দিয়েছিলো পুষ্পপ্রেমে পাগল মাধব। হাল্কা সুবাসে মনটা জুড়িয়ে গেলো চাঁদের।

মাধবের কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো-- এই ফুল দেওয়াকে কি তুমি আঁতলামো বলবে ?

মাধবের সঙ্গে সম্পর্কটা ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে তবে এর পরিণতি কী কেউ জানেনা।

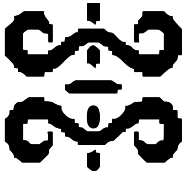

# ১৪

সেদিন ছিলো পুর্ণিমা। যোসেফের আড্ডার স্থল একটি কফি শপ। নিজের শপ নয়। মাডিকেরি শহরে একটি মোটামুটি কফি শপ। এদিকেই আছে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির।

লিঙ্গরাজ দ্বিতীয় এই মন্দির নির্মাণ করেন মুসলিম স্টাইলে, ১৮২০ সনে। কথিত আছে এক অত্যন্ত শুদ্ধ ব্রাহ্মণকে অন্যায়ভাবে রাজা সাজা দেন। পরে তার বিদেহী আত্মাকে শান্ত করতে মন্দির নির্মিত হয়। দরজায় একটি তাম্রফলকে মন্দিরের ইতিহাস রাজা লিখে গেছেন। মন্দিরটি দেখতে দরগার মতন এবং একটি লিঙ্গ আছে এখানে। যোসেফের আজকাল হিন্দুত্বের সম্পর্কে শ্রদ্ধা হওয়াতে সে প্রায়ই বিভিন্ন মন্দিরে যায়। এখানেও এক ঢুঁ মেরে যায় এই চত্বরে এলে। সে মাদুরাইয়ের মীণাক্ষী মন্দিরে গেছে, গেছে তিরুপতি ও সাবারিমালায়। তবে সাহেব বলে বহু জায়গায় তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

–জাতপাত , অন্ধত্ব সমস্ত কিছু ঢেকে দেয় হিন্দু ধর্মের আসল রস ! মনে মনে ভাবে যোসেফ । কাউকে কিছু বলেনা । কারণ কেউ শুনবে না । তারা নিজেদের গন্ডীতেই আবদ্ধ । অন্য কারো কথা শোনার তাদের ফুরসৎ নেই ।

যোসেফের এক মাসী বিদেশে পাদ্রী ছিলেন । কিন্তু উনি লেসবিয়ান বলে কখনো চার্চে হেড পাদ্রী ওঁনাকে দায়িত্ব পূর্ণ কাজ দিতেন না ।

শুনে যোসেফের খারাপ লেগেছিলো । তখন সে নাস্তিক ছিলো । তবুও সাধারণ যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে দেখেছিলো যে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তো তাঁর কাছে সবাই সমান । লেসবিয়ান গে বলে কোনো ভেদাভেদ ঈশ্বর পন্থীদের করা উচিৎ নয় ।

ভারতে গে কালচার নিয়ে আলোচনা হলেও লেসিবিয়ানরা আড়ালেই থাকেন ।

যোসেফের এক বন্ধুর ছেলের ডাউন্স সিন্ড্রোম আছে । তাকে বন্ধু একটি হোম থেকে এনে পালন করে । সে এখন বেশ বড় । অল্প স্বল্প কাজ করে হোমেই ।

তাদের হস্তশিল্প বিক্রি হয় বাজারে । তো সেই হোমের মালিক গে ।

তাতে কেউ কিছুই মনে করেনি । অথচ পাদ্রী হলেই দোষ ?

এখানে মাডিকেরি শহরে সে কূর্গের সমস্ত প্ল্যান্টারদের সঙ্গে মাসে একবার মিলিত হয় । তার মধ্যে কফি , চা, কর্ডামম, ভ্যানিলা , পেপার সব রকমের ফসলই আছে । ওখানে প্ল্যন্টাররা মতের আদান প্রদান করেন , মার্কেটের সম্পর্কে আলোচনা, হাসি মস্করা , গল্প, আড্ডা চলে । মদ্য পান তো আছেই । সেসব হয়ে গেলে যোসেফ এই ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে ঢুঁ দেন । ওর কফি ক্ষেতে আছে অনেক বড় বড় সিলভার ওক ও অন্যান্য গাছ । সেইসব গাছ এর কাঠ ও

অন্যান্য যখন কফির ফলন মন্দা যায় তখন ব্যবসা চালাতে সাহায্য করে। সেই গাছের কাঠ নানান কাজে লাগে।

কফি ক্ষেতে আছে দুই ধরণের কফি গাছ। অ্যারাবিক আর রোবাস্টা ।

অ্যারাবিক ছোট সাইজের গাছে , রোবাস্টা বড় পাতার গাছ । অ্যারাবিকে সুবাস হয় রোবাস্টা ঘন কফি দেয়। মাঝে মাঝে ওর কফি বাগিচায় লোকাল টুরিজম কোম্পানি ও বাইরের টুরিজম কোম্পানি থেকে প্ল্যান্টেশান ট্যুর হয়। বহু মানুষ আসেন জেনে নিতে কফির খুঁটিনাটি। তারপরে বাগানের কফি খেয়ে ( সেটা পর্যটকের পছন্দ কারণ অ্যারাবিক না রোবাস্টা খাবেন তা তিনিই স্থির করেন ) ফিরে যান গোঠে।

একবার একজন ট্যুরিস্ট জিজ্ঞাসা করেছিলো : এই এত বড় বাগান আপনার এখানে ভুত নেই ? যোসেফ হেসে বলেন: থাকলেও আমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে কারণ কোনদিন আমার চোখে পড়েনি।

তারপরে আরো বেয়াড়া প্রশ্ন : এই অজ্ঞাতবাসে থাকতে কেমন লাগে ? সিটি লাইফ মিস করেন না ?

নাহ্ , এখানে ভালই আছি। আমি তো বিদেশ থেকে এসেছি। এই জায়গা ভালো লাগাতে এখানেই ঘর বেঁধেছি। আমার পুত্র বিদেশেই আছে । স্ত্রী এখানে আমার সঙ্গে থাকেন । আর এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর বেশি দুর নয়। ওখানে গিয়ে মাঝেমাঝে হৈ -হল্লা হয়। আমার সেডানে বসে দুজনে চলে যাই । আমি খুব স্পীডে গাড়ি চালাই। মাইশোরে একটা ছোট ব্রেক নিই। ওখানে কাফে কফিডেতে বসে ছোট ছোট ইডলি ( মিনি ইডলি ) সম্বর দিয়ে খাই। সঙ্গে মশালা

ওমলেট । বেশ লাগে ট্যুর । কদিন সিলিকন শহরে কাটিয়ে ফিরে আসি বুনো জীবনে ।

এলাচ গাছের গোড়ায় অনেক এলাচ ধরেছে , থোকা থোকা এলাচ । সেগুলো দেখে পর্যটক উত্তেজিত । এলাচ খাওয়া হলো ছিঁড়ে । কচি সবুজ এলাচ । অপুর্ব গন্ধ । শহুরে মানুষ উত্তেজিত তাই দেখে ! কেউ কেউ এখানেই থেকে যেতে চান বাকি জীবন । একটি গাছ মধুমেহ অর্থাৎ ডায়বেটিজ এর জন্য মহৌষধ । কোনো ওষুধে কাজ না দিলে এতে কাজ দেয় । পাতা ছিঁড়ে খেয়ে দেখলো ঈষৎ । বেশ মিষ্টি খেতে । গাছটার পেটেন্ট নিতে যোসেফকে কেউ কেউ পরামর্শ দিলো । যোসেফ বললো : তার অনেক বৃদ্ধ কর্মী এই পাতা খেয়ে সুস্থ আছেন ।

তার এখানে কর্মীরা খুবই সুখে আছেন । মেয়ে ও পুরুষের সমান মাইনে আর কোনো কফি বাগানে নেই । এছাড়া মেয়েদের ম্যাটার্নিটি লিভের ব্যাবস্থা আছে অর্ধেক পে সহ । অর্থাৎ এক কথায় খাসা ব্যাবস্থা । একেবারে সাহেবি কায়দা ।

এরপরে টুরিস্টরা চলে যান কফিফল পেষা দেখতে । কিভাবে বীজ থেকে কফি তৈরি হয় সেসব ঘুরে দেখেন । কর্মীরা এখানে সুখীই মনে হয় দেখে । অন্তত: মালিকের সামনে ।

যোসেফের কফি বাগানের পাশে অনেকটা জায়গায় চাষ হয়না । কারণ ঐসব এলাকা স্যাক্রেড বলে পরিগণিত । সেখানে লোকগাথা হিসেবে দেবতারা বাস করেন । তাই ঐসব জায়গা কেউ ডিস্টার্ব করেন না । কুর্গকে বলা ভারতের স্কটল্যান্ড । সেখানেও এই জাতীয় দেবত্বে উন্নিত স্থান সত্যি বিস্ময়কর যোসেফের কাছে । যাইহোক তার কোনো উপায় নেই , মেনে নেওয়া ছাড়া ।

আজকাল ভেঙ্কির সঙ্গে প্রায়ই আড্ডা হয় তার। দুজনে বসে পাখির ডাক শুনতে শুনতে চা ও কফি পান বেশ আনন্দদায়ক। সঙ্গে চলে ভারতের আধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা।

যোসেফ তো তান্ত্রিকবাবাকে দেখে খুবই ইম্প্রেসড্। সেসব গল্পই হয়। বিভিন্ন বই পড়ার নেশায় মেতেছে সে এখন। পড়ছে বিবেকানন্দ, পরমহংস যোগানন্দ কিংবা অন্যান্য বই। তান্ত্রিক বাবাই উপদেশ দিয়েছেন যে সব সময় ইলুমিন্ড ঋষিদের লেখা পড়বে। অন্যেরা বেশির ভাগ সময়ই জিনিসগুলো গুলিয়ে ফেলে।

তাই যোসেফ অর্ডার দিয়ে অনেক বই আনিয়েছে খোদ ব্যাঙ্গালোর থেকে।

ভেঙ্কিরও এখন বেশ কাটছে। সম্প্রতি মাধবের বাসায় এক কবির আড্ডায় তার ডাক পড়েছিলো অতিথি হিসেবে, চিফ গেস্ট। সে চিফ সেক্রেটারি ছিল সেই কারণে।

সেখানে ভেঙ্কি হাজির হয়েছিলো স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু তার জন্য যে এত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে সে বোঝেনি। সেখানে গিয়েই আলাপ হল একটি ছেলের সঙ্গে। সদ্য বিলেত থেকে এসেছে। সে একজন কবি। জানা গেলো সে ভেংকির সেই পরিত্যক্ত পুত্র। ছেলেটি নিজের দূর্ভাগ্যের কথা, নিজের হতভাগিনী মায়ের দু:খের কথা সর্বসমক্ষে বলছিলো। একজন কবির সংবেদনশীল মন নিয়েই সেইসব ঘটনার চুলচেরা বিশ্লষণ করছিলো ছেলেটি। ভেঙ্কির নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিলো।

ছেলেটি একটি কবিতা পড়ে শোনালো। নিজের লেখা।

দেহপসারিনী আমার মা --

অনুবাদ করলে দাঁড়ায় অনেকটা এরকম --

ছিনিমিনি খেললে যাকে নিয়ে

আজ সে হীরের টুকরোর আধার

নারীর কেন ঘর হয়না , পুরুষ বোঝো ?

অধিকার বোধের পাশায় হারিয়েছো তার মন

অপ্সরা সে , বহুভোগ্যা –

নাগরিক হয়েছে তার জীবন , তবুও

নারী প্রকৃতি নারী মাদার ।

কবিতাটি শুনে হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ ।

ভেঙ্কির যেন নতুন করে চেতনা হল । মনে হল আরো কিছু বছর যদি সে টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে যেতে পারতো ,যেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতো তাহলে ।

এই প্রতিভাবান কবি যে তারই রক্তে গড়া সে কথা কি আর আজ কাউকে বলা যায় ?

এই জনসভায় অসহায় এক পিতা বসে আছে চোরের মতন । লজ্জায় , বেদনায় তার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন । তার গুণধর পুত্র সামনেই কিন্তু তাকে সে ছুঁতেও পারছে না ।

একবার মাধব যেন বলেও গেলো : আশ্চর্য দুনিয়ার ব্যাপার স্যাপার । ভেঙ্কিসাহেব এই ছেলেটির মুখের আদল একেবারে আপনার মতন । খেয়াল করেছেন কি ?

যেন আপনি যুবক বয়সে দাঁড়িয়ে আছেন আমার গৃহে !

ভেঙ্কির দুই চোখে বেয়ে নীরবে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো , সবার অলক্ষ্যে ।

ব্যাপারগুলো খুব অদ্ভুত । ভেঙ্কির ঠাকুর্দা চাষ করেছিলো বিশাল জমি ।

উনি মারা যাবার পরে দুই ছেলে ভাগ পেলো । ওর জ্যাঠা বদমাইশি করে যেদিকে কম ফলন হত সেদিকটা ছোট ভাইকে দিয়ে দেন ।

পরের বছর থেকে দেখা যেতে লাগলো যে ওঁনার জমিতে ফলন হচ্ছে না অথচ ভেঙ্কিদের জমিতে হচ্ছে । আশ্চর্য ঘটনা , যেমন এটাও । ভেঙ্কির লুপ্ত জীবনের সন্তানের বেড়ে ওঠার কাহিনী ।

প্রফেসর শ্রোত্রির বাড়িতে রোজই মহড়া চলে ছাত্রদের । বিদ্যা শিক্ষার । সঙ্গে মজবুত হতে লাঠি খেলা , কুংফু ইত্যাদি । কারণ প্রফেসর মনে করেন দেহ শক্ত নাহলে বিদ্যাভ্যাসে মন থাকবে না । সবাই ওঁনার বাহবা দেন ।

আজকে ভেঙ্কিকে উনি চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন । ভেঙ্কি ঠিক করেছে যাবেনা । কারণ পুত্রকে দেখার পর থেকে মনটা বড় উতলা হয়ে আছে । কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না । একবার মাধবকে জিজ্ঞেস করেই ফেললো– ও আবার কবে আসবে এখানে ?

মাধব হেসে বলে ওঠে : আপনি দেখি ওর পোয়েমের ফ্যান হয়ে গেছেন ! বাহ্ , ভালো ভালো , ও এরকম গুণী পাঠক পেলে বড়ই খুশি হবে ! হ্যাঁ ও তো প্রায়ই আসে এখানে । আমার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে আলাপ ।

মাঝে মাঝে ভাবেন ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন , নিজের কথা খুলে বলে ক্ষমা চাইবেন । সে কি তার বৃদ্ধ বাপকে ক্ষমা করবে না ? সে তো একজন কবি !

আবার সামাজিক ভয়ে পিছিয়ে যান । আজ তার স্ত্রী , কন্যা আছেন । তারা কী বলবে ? বন্ধুরা কী বলবে ? ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান ভেঙ্কি ।

কূর্গ হকির দেশ । বৃটিশরা কুর্গকে কফি চাষের সঙ্গে হকিও দিয়েছে । এখানকার অনেক হকি খেলোয়াড় ভারতের জাতীয় টিমে ছিলেন , অলিম্পিকে ছিলেন ।

মাঝে মাঝে ছোট সবুজ মাঠে ভেঙ্কি হকি খেলেন শখে । তবে প্রথম পছন্দ বক্সিং ।

নেটে বসলে আজকাল মোনালিজা বিরক্ত করে । প্রাইভেট মেসেজ পাঠায় । ভেঙ্কি তাকে বলেনি যে তার বাসস্থান কূর্গ । আজকে শুনলো যে মোনালিজা বাড়ি যাচ্ছে । তার বাড়িও কূর্গে । সেখানে তার বাবা মা থাকেন । তার হাতে কি একটা পোড়া দাগ হয়েছে কিছু রান্না করতে গিয়ে সেটা কী করে ঢাকা যায় তার পরামর্শ চাইছিলো ।

বাড়িতে দেখলে সবাই বকবেন । ভেঙ্কি বেশি কিছু বলেনি । আসলে সে মোনালিজার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়না কিন্তু মেয়েটি পেছন ছাড়েনা কিছুতেই । ভদ্রতার খাতিরে তাকে কিছু বলতে ভেঙ্কির বাধে । তাই সম্পর্কটা চালিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এবার স্থির করেছে ধীরে ধীরে সরে আসবে । আর সম্পর্ক বাড়বে না ।

এই শেষ মাস , তারপরে সুতো কেটে দেবে । কিন্তু সুতো যে এত তাড়াতাড়ি নিজের থেকেই ছিঁড়ে যাবে সে কথা কি ভেঙ্কি আঁচ করতে পেরেছিলো ?

প্রায় বিকেলে অস্তমিত সূর্যে´র রক্তিম আভা মেখে , সবুজ বড় বড় সুগন্ধী গাছের ছায়ায় ছায়ায় যখন ক্লান্ত , বিধ্বস্ত মেয়ে বাড়ি ঢুকলো তখন তার ব্যান্ডেজ করা হাতের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে চমকে উঠেছিলো ভেঙ্কি । তারপর যা হল তা বিষন্ন ইতিহাস ।

যে মেধাবি মেয়ে আজ থেকে কয়েক বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে পড়তে গিয়েছিলো সে যে ধীরে ধীরে এক trollop এ রূপান্তরিত হবে ভেঙ্কি কল্পনাও করেনি । যেই সন্তানকে সে হেলায় ফেলে এসেছিলো আজ সে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে , যাকে আপন বলে কোলে পিঠে মানুষ করেছে সে আজ স্বেচ্ছায় সবার মনোহরিনী ।

ভেঙ্কির স্ত্রী বহুদিন বাদে ঘরে ফেরা মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠেছে । মেতে উঠেছে পোষা কুকুর ম্যাকারেনা ।

মেয়ে কুকুরকে নিয়ে খেলছে , জোরে জোরে গান গাইছে :

-----Dale a tu cuerpo alegria, Macarena

Hey Macarena

*When I dance they call me Macarena*

*and the boys they say que soy Buena*

*they all want me*

*they can't have me*

*so they all come and dance beside me*

*Move with me*

*Chant with me*

*and if your good I'll take you home with me---*

গানের কলি শুনে ভেঙ্কির আপাদমস্তক জ্বলে যাচ্ছে রাগে ! মাথার শিরা গুলো দপদপ করছে ! ভেঙ্কি জ্বলে উঠছে।

অসহ্য অসহ্য , বন্ধ কর এই গান , বন্ধ কর – বলেই ঢিসুম করে এক ঘুষি , মেয়ের নাক ফেটে রক্ত ঝরছে ! সবাই হতবাক !

মা দৌড়ে এলেন !

একি তুমি ওকে মারছো কেন অকারণে ? এত দিন পরে মেয়ে বাড়ি এলো ?

মেয়েও হতবাক। বাবার হঠাৎ কী হল ?

ভেঙ্কি ততক্ষণে গলা সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করছে– ব্যাঙ্গালোরে তুই কী করিস নেটে বসে বসে ? তোর হাত পুড়লো কী করে ? তোর লজ্জা করেনা ? আমি এত টাকা খরচ করে তোকে ওখানে পড়তে পাঠিয়েছি তুই কী করছিস ?

ভঙ্কির যেটা খেয়াল ছিলনা তা হল যে তার নিজের এত ইনফর্মেশন কোথা থেকে এলো এটাও মেয়ের মনে প্রশ্ন চিহ্ন হিসেবে দেখা দিতে পারে। তবে ভেঙ্কি তো নেটে মন্দ কিছু করেনি শুধু সময় কাটাতে চেয়েছে।

মা , বাবা মেয়ের এই ঝামেলায় কিংকর্তব্যবিমুঢ়।

ভেঙ্কির দিকে চাইতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে চলে সে : তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করো নেটে মোনালিজা নাম নিয়ে বসে বসে সে কী করছে ! এই শিক্ষা দিয়েছো মেয়েকে তুমি ? বিশ্বের বেশ্যা হবার জন্য আমি ওকে এত টাকা খরচ করে পাঠিয়েছি?

মা হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারছেন না , আর মেয়ে ?

সেও কুপোকাৎ ! তার এই লুক্কায়িত জীবনের ইতিহাস বাবা জানলেন কী করে ? আশ্চর্য তো !

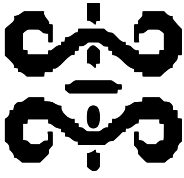

# ১৫

তান্ত্রিক বাবার সঙ্গে বেশ জমে উঠেছে। চাঁদ এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই ওঁনার কাছে যায়। সেখানে সে যোসেফকেও দেখেছে। যোসেফও যায়।

চাঁদের সঙ্গে কথাও হয়েছে তার। চাঁদকে সে জ্ঞানও দান করেছে হোমিওপ্যাথি নিয়ে। – লুক চাঁদ, সেই কবে হ্যানিম্যান কি একটা করে গেছেন এই দেখো এখনো সেটা চলছে।

চাঁদ মৃদু হেসে ওঠে। তারপর মজা করে বলে : কিন্তু লোকে তো বলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিই নয়।

যোসেফ এখন অনেক পরিণত। আগের মতন এইসমস্ত ধোঁয়াশা পূর্ণ এরিয়া নিয়ে সে তর্ক করেনা কিংবা তাচ্ছিল্য করেনা। সে এখন বোঝে যে সে যা অনুধাবন করতে পারেনা তার বাইরেও জগৎ আছে, বিদ্যা আছে।

তাই প্রতিবাদ করে : নাহ নাহ কে বলেছে ওসব ? ওগুলো সব বাজে কথা !

লোকে তো কিছু না কিছু বলতেই থাকে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই । হোমিপ্যাথি ইজ গ্রেট ম্যান ! দেখোনা ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথিতে পেনলেস ডেথ হয় । আঁচিল ঝরিয়ে দেয় অপারেশন বিনা , ক্যালিফসের মতন বায়ো কেমিক ওষুধে শরীরে শান্তি আনে । ভালো ভালো চাঁদ হোমিওপ্যাথি খুব ভালো । অনেকে অবশ্যই বদনাম দেয় যে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা ওষুধে স্টেরয়েড মিলিয়ে দেন যাতে রোগটা তাড়াতাড়ি সেরে যায় !

চাঁদ আবার হাসে । মনে মনে বলে : তুমি ভালো বললেই কি আর মন্দ বললেই কি হোমিও তার নিজ গুণেই ভাস্বর । চাঁদ মাঝে মাঝে ভাবে সে একটা হোমিওপ্যাথির চেন ক্লিনিক খুলবে ডক্টর বাত্রার মতন । তারপর সারা ভারতে ছড়িয়ে দেবে এই চিকিৎসা শাস্ত্র ।

ভেঙ্কিও এসেছিলো তান্ত্রিকবাবার কাছে । তার সমস্যা নিয়ে । তার দুই সমস্যা । নিজের মেয়ে বিপথগামী আর ইলেজিটিমেট চাইল্ড সমাজে উদ্ভাসিত । এই দুই মেরুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ভেঙ্কি ভেবে পায় না কী করবে ।

বাবা বলেন : ধৈর্য্য ধরো । তোমার মেয়ে ঠিক পথে ফিরে আসবে কিনা সেই বিষয়ে আমি কোনো কথা দিতে পারছি না । ছেলেকে বুকে টেনে নাও সে তো তোমারই অংশ । তাকে দূরে সরিয়ে রেখো না । সমাজ কে এত ভয় যখন তখন যৌবনে উচ্ছৃখল হয়েছিলে কেন ? বলে ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠেন ১০৯ বছরের বাবা । ভেঙ্কি চুপচাপ থাকে ।

বাইরে আজ কিসের প্রসেশান যাচ্ছে । বাবা বললেন : ও হল গুণী মানুষের মিছিল । সবাই কবি , পন্ডিত মানুষ । যাচ্ছে সঙ্গমের দিকে । হাল্কা বাতাসে ভেসে আসছে

মৃদু সুর । সুর দিয়ে কবিতা পড়ছেন ওরা মনে হয় ।

এখানেই একবার এক আদিবাসী শিল্পীর দেখা পেয়েছিলেন ভেঙ্কি ।

শুনেছিলেন সে ছবি আঁকে কিন্তু ইদানিং কোনো কারণে আঁকা ত্যাগ করেছেন ।

ভেঙ্কি কথা বলে অনুরোধ করেন যেন একটা ছবি এঁকে দেন , অনেক দূর থেকে এসেছেন উনি ।

শিল্পী তার আগেই গাঢ় আলাপচারিতায় মেতে উঠেছিলেন বলেই কিনা জানিনা দীর্ঘদিন পরে ছবি আঁকতে বসেন । কিন্তু রং তুলি কোথায় ?

হাত কেটে রক্ত বার করে মাথার চুল ছিঁড়ে একটি কাঠির সঙ্গে বেঁধে তুলি বানিয়ে এঁকে ফেলেন একটি আদিবাসী রমণীর অবয়ব ।

বলেন : শিল্পীর চোখে সব নারীই সুন্দর । তাই না ?

ভেঙ্কি মুগ্ধ । কথা হারিয়ে গেছে ওঁনার । ছবির চেয়েও ছবি আঁকার পদ্ধতিটি দেখে । সত্যি এই নাহলে জাত শিল্পী !

রঙীন প্রসেশান । নারী , পুরুষ , বৃদ্ধের মিছিল । একটা দোলনা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তাতে বসে আছেন মহাকবি । সামনে যক্ষগানের নাচ ও অভিনয় করে দেখাচ্ছেন যক্ষগান শিল্পীরা । আর প্রসেশান এগিয়ে চলেছে ।

সবাই রং চং-এ পোশাকে সুসজ্জিত । কুল কুল করে বয়ে চলেছে নদী । সরু নদী । দূরে সঙ্গম । বিভিন্ন মানুষ পারলৈকিক ক্রিয়ায় ব্যস্ত । কেউ ডিজিক্যামে ছবি তুলছে এই প্রসেশানের , তার মধ্যে বিদেশীরাও আছেন ।

যোসেফ একজনের সঙ্গে আলাপ করলো । সে প্রফেশন্যাল ফটোগ্রাফার ।

সারা দুনিয়া ঘুরে ছবি তুলছে । গ্রীস , চীন , তিব্বত , জাপান , আরব বেদুইন , ব্রেজিল সমস্ত তুলে এখন ভারতে এসেছে । যোসেফ তাকে নিজের কফি বাগিচায় ডাকলো । বললো ছবি পাবেন সঙ্গে আমার বাগানের পিওর কফি ।

ভদ্রলোক যার নাম স্যাম সে সম্মতি জানালো । যোসেফ নিজের কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করলো । স্যাম বললো : আজকাল দেখুন না সুপারলেটিভের যুগে সবই অসাধারণ, দূদার্ন্ত । এই সব বোদ্ধারা কোনদিন মাস্টার ক্রিয়েশন দেখেনি ? আর আমাদের ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কিছু সুন্দর সুন্দর ল্যান্ডস্কেপের ছবি তুললেই হয়না । পরিণত সাবজেক্ট ও আলোর খেলাও ইম্পর্টেন্ট । আসলে ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে হয় ।

সব আলোকচিত্রী সেটা পারেন না । তাদের সেই বোধটাই নেই । দামী ক্যামেরা কিনে ফটাস্ ফটাস- করে কিছু সুন্দর জায়গার ছবি তোলা দিয়ে কেউ ভালো আলোকচিত্রী হননা । অথচ দেখুন আজকাল সেইসব ছবিই কমিউনিকেশানের দৌলতে বাজারে ভালো ছবি বলে পরিগণিত হচ্ছে ।

যোসেফ হেসে বলেন : চলে আসুন আমার ডেরায় আরো গল্প হবে । কফির গন্ধ মেখে !

পরে যখন তান্ত্রিক বাবার কাছে সে গেলো দেখলো ভেঙ্কি সেখানে রয়েছে। দুজনে কিছু আলাপন হল। তারপর ভেঙ্কি চলে গেলো।

যোসেফ বাবাকে অনেক প্রশ্ন শুরু করলো যেমন সে করে থাকে।

তার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন হল :

এই যে চারিদিকে এর অরাজকতা চলেছে তার জন্য আপনার ঈশ্বর কী করছেন ?

চিন্নাসোয়ামিজি ওরফে তান্ত্রিকবাবা খুব হেসে ওঠেন। তারপর বলেন : কে বললো ঈশ্বর কিছু দেখছেন না ? তিনি সবই দেখছেন। সময় রাইপ হলে সব হবে। আর যখন তিনি নিজ হাতে দন্ড নেবেন দা ওয়ার্ল্ড উইল শেক।

বলেই আরেক চোট হেসে নিলেন উনি। তারপর বললেন : চা খাবে ?

চল আমি চা করবো। আমিও খাবো।

যোসেফ মাথা নাড়িয়ে তামিল কায়দায় বলে ওঠেন আ-মা , আ-মা। অর্থাৎ হ্যাঁ।

তারপরে দুজনেই হেসে ফেলেন।

বাবার ছোট গৃহকোণের দিকে পা বাড়ায় দুজনে। এ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হাতের তৈরি করা চা বড়ই সুস্বাদু লাগে যোসেফের। সঙ্গে টা ও জোটে।

খালি পেটে চা খেয়ো না। বলে বাবা দু খানা শক্ত বিস্কুট এগিয়ে দেন।

লোকাল সস্তার বিস্কুট । তবু সেই বিস্কুটই যোসেফের অমৃত মনে হয় ।

বহুক্ষণ কথা হয় । কথা হয় দেশের হালহকিকৎ নিয়েও ।

যোসেফ বলে : আচ্ছা বাবা এই যে লড়াই , যুদ্ধ , এত রক্তক্ষয় এগুলো কি কোনদিন বন্ধ হবে ?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন : লড়াই বন্ধ হবেনা যতদিন ইগো থাকবে । বাহ্যিক লড়াই চলবেই । আর ইগো পুরোপুরি নস্যাৎ করতে হলে সাধনা ব্যাতীত কোনো পথ নেই । কিন্তু সেসব জিনিস তো সাধারণ মানুষের জন্য নয় কাজেই তারা আউট অফ ইগো লড়াই করবেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে । এই দেখোনা উগ্রপন্থীরা যে লড়াই করছে এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । কোনো ধর্মগ্রন্থ বিভেদ শেখায় না । কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এইসব প্রচার করে সাধারণ , সরল মানুষকে উল্টোপথে চালিত করছে ।

যোসেফ চুপ করে শুনে চলে , ইগোর জন্য যে লড়াই এসব সে পল ব্রানটনের বইতেও পড়েছে । খানিক পরে বলে : কিন্তু তসলিমা নাসরিন নামক কন্ট্রোভার্সিয়াল রাইটার তো অন্যরকম প্রচার করছেন ! ঈশ্বর বলে কেউ নেই ।

বাবা হেসে বলেন : ঐ মেয়েটার সাহস আছে । ও যা অন্যায় দেখেছে তাই লিখেছে ।

ওগুলো ওর অভিমানের কথা । ঈশ্বরের স্নেহ পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে । আসলে মানুষের জন্য ধর্ম । ধর্মের জন্য মানুষ নয় । এই ভুলটাই অনেকে করে ফেলেন তাই সমাজে প্রতিবাদী তসলিমরা জন্ম নেন । ধর্ম মানে সহনশীলতা । ধর্ম মানে পরিণত মন । আমার গুরুই সেরা আর সবাই ভন্ড , আমিই স্পেশাল সোল আর সবাই

ফেলনা , অল্পেই আমি ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়ি , আপাদমস্তক ইগোতে , টাকার গরমে পরিপূর্ণ আবার সেই আমিই ভক্তিসাগর , ঈশ্বর আমাকে নিরালায় দেখা দেন এগুলো সবই ভন্ডামী । এরাই সমাজে নাস্তিকের বিশ্বাস বাড়ায় , স্পিরিচুয়ালিটিকে মোলেস্ট করে ।

প্রকৃত ধর্ম এগুলো শেখায় না । ধর্মকে ছেড়েও মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু মানুষ না থাকলে ধর্মের কী প্রয়োজন ? বিভিন্ন যোগ পদ্ধতিতে মনকে মেরে ফেলতে হয় ।

কর্মজোগ , জ্ঞানযোগ , ভক্তিযোগ ও রাজযোগ । সব যোগই সেই মনের মৃত্যু কামনা করে । পৌছাতে হয় থটলেস স্টেটে । তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করে । মন বলেই কিছু থাকবে না । মিশে যাবে মহাজাগতিক চেতনার সঙ্গে ।

আমি যে আমার দেহের বাইরেও আছি , আছি ইউনিভার্স জুড়ে ও সেই অস্তিত্ব আসলে একটি সুপ্রিম স্টেট অফ জয় এটা উপলব্ধি করাই সেল্ফ রিয়েলাইজেশান ।

বাবা একটু থামলেন । একটু যেন ফোকলা দাঁতে হাসলেন ।

– যাক তোমাকে অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম !

যোসেফ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে ওঠে : আচ্ছা যোগীপুরুষরা তো ধ্যানে অনেক কিছু জানতে পারেন তো ওঁনারা নিশ্চয়ই দেখতে পান যে বিন লাদেন কিংবা দাউদ ইব্রাহিম কোথায় লুকিয়ে আছে ?

হ্যাঁ পেতে পারেন যদি চান।

তাহলে গোয়েন্দাদের জানান না কেন ?

হা হা হা , আবার বাবার দরাজ দিল হাসি । তারপরে নিচু স্বরে :

সমাজে আরো বড় বিন লাদেন আছেন যারা মুখোশ ধারী , তাদের কেউ কেউ বিন লাদেন তৈরি করেছেন ও করে চলেছেন,তাদের আগে শনাক্ত করা হোক কী বলো ?

যোসেফ কৌতুহলি হয়ে ওঠে। বলে : কিন্তু তারা কারা সোয়ামিজি ?

বাবা বলেন : সে খুঁজে বার করার দায়িত্ব তোমার না । অন্য আরেকদিন আলোচনা হবে আজ আমি বেরোবো , আমাকে একবার মাইশোরে চামুন্ডেশ্বরী মন্দিরে যেতে হবে। ওখানে এক বিশেষ পুজো আছে আমি তাতে অংশ নেবো বলে কথা দিয়েছি পুরোহিতকে। তুমি অন্য সময় এসো আরো আলোচনা হবে।

অনেক ক্ষণ চলে আলোচনা বাবা দরজা দেখনোতে একটা সময় যোসেফ ফিরে আসে নিজের ডেরায় । বাবার সান্নিধ্য তার খুব ভালোলাগে। আজকাল তার ইচ্ছে করে ব্যবসাপত্র কারো হাতে তুলে দিয়ে যোগী তপস্বী হয়ে যেতে। পুষ্পিত কফি পল্লবের ঘ্রাণ তাকে আর আকর্ষণ করেনা।

ভঙ্কির মেয়ে ফিরে গেছে ব্যাঙ্গালোরে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে খুব ঝামেলা হওয়াতে সে পড়া ছেড়ে দিয়ে সোজা একটি কল সেন্টার জয়েন করেছে।

সেখানে দিনের বেলায় মদ্যপান করে সময় কাটায়। চাকরির ফাঁকে ফাঁকেই নোংরামো করে । গভীর রাতে এক একদিন এক একটি বহুমূল্য গাড়ি এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে যায় এক কামরার ফ্ল্যাটে । অনেক সময়ই সিউকিউরিটির লোকেরা তাকে লিফট্ করে পৌছে দেয় ঘরে কারণ সে মাতাল হয়ে ফেরে। একবার এক সিকিউরিটির লোক তার বক্ষে আলতো চাপ দিয়েছিলো । কথায় বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তখন লোকটি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়।

মদের ঘোরে মেয়েটি তাকে মাফ করে দেয় । সে নিজের জগৎ নিয়েই আছে । তার নাম সৌন্দর্য্য হলেও চরিত্র কালিমালিপ্ত ।

অন্য দিকে তার বাবা নিজের গুণধর ইলেজিটিমেট পুত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে । পুত্র তাকে মাফ করেই দেয়নি উল্টে অত্যন্ত নম্র ও সুন্দরভাবে এও বলেছে যে : আমি গর্বিত যে আমি আপনার মতন গুণী মানুষের ঔরসজাত সন্তান । যদিও আপনার ছোট্ট ভুলেই আমার জন্ম তবুও এই জন্মই আমি চেরিশ করি । আপনার জন্যেই আমি পৃথিবীতে আসতে পেরেছি । পরের জন্মে আমি আপনার স্ত্রীর সন্তান হতে চাই ।

ভেঙ্কি তাকে কোলে তুলে নিয়েছে । এই তো প্রকৃত সংবেদনশীল কবির লক্ষণ!

তার স্ত্রী লজ্জায় বাড়ি থেকে বেশি বার হননা । যতনা স্বামীর জন্য বিব্রত তার চেয়েও বেশি নিজের কন্যার জন্য ।

কূর্গে স্বেচ্ছায় জীবন কাটানো চিফ সেক্রেটারি ভেঙ্কটেশ বোনাপ্পা তার বিবাহ বহির্ভূত সন্তানকে সমাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন এটা এখন লোকাল সব নিউজ পেপারের সবচেয়ে হট খবর । কেউ তাকে মহামানব বলছেন কেউ গালাগালি করেছেন এই বলে যে এরাই সমাজে এক একটা মাথা হয়ে বসেছে বলে ।

কুর্গ কারো কাছে ভারতের স্কটল্যান্ড হলেও কারো কাছে কাশ্মীর । সবুজ সবুজ পাহাড়িয়া প্রাঙ্গন সঙ্গে চা কফি ভ্যানিলা গোলমরিচের বাগান , কমলা বাগান , হাতির পাল , পাখির কলতান ও ঘুম ভাঙা সকালে কফির সুবাস কূর্গকে এক মোহময় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে । শোনা যায় এখানে আলেক্সান্ডার দা গ্রেটের সৈন্যকূল যুদ্ধ ত্যাগ করে বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন । আলেক্সান্ডার ফিরে যান তার দেশে । সকাল বিকেল এখানে শীতল আবহাওয়া থাকে ,

সকালে কুয়াশা , সন্ধ্যায় হিম ঝরে । আলেকজান্ডারের সৈন্যের বংশধর কুর্গীরা । তাই আজও তারা সঙ্গে করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরে । লাইসেন্স বিনাই । ছোরা জাতীয় অস্ত্র সঙ্গে থাকে অনেকটা সোনার কেল্লার জঙ বাহাদুর রাণার সেই অস্ত্রের মতন । এই ছোরা তাদের অলঙ্কার ।

শকুন্তলাও একটি ছোরা রাখেন তবে ব্যবহার করার কথা কখনো ভাবেননি ।

শকুন্তলার দিন কাটে সংশয়ে । সে যা লেখে তাই ফলে যায় এই ভয়ানক সত্য কী করে ঘটছে সে ভেবে পায়না । সদ্য দেখা হয়েছিলো পুষ্পপ্রেমী মাধবের সঙ্গে । সে তাকে বলেছিলো : আপনি সবসময় অঙ্ক করেন কেন ? এত অঙ্ক ভালোলাগে আপনার ?

শুষ্কং কাষ্ঠং মনে হয়না ?

শকুন্তলা হেসে বলে উঠেছিলো : অঙ্কও একধরণের কবিতা মিস্টার মাধব , শুধু ছুঁতে হয় সেই কবিতাকে । আমি তো লিখি আপনি জাননে তবুও আমার কাছে কবিতা বা গদ্য রচনার থেকে অঙ্কই বেশি কাব্যিক । দেয়ার ইজ মিউজিক ইন ম্যাথেমেটিক্স্ ।

আমার আর এই জীবনে হলনা অঙ্কের মালাই সন্ধান করা , আমার কাছে ও বড় নিরস জিনিস ।

কিন্তু আপনি তো ব্যবসাদারও !

হ্যাঁ তাতে হিসেবের অঙ্ক লাগে , ব্যালেন্স শীট , প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট , ট্যাক্স ক্যালকুলেশান তবে সেসব করার জন্য লোক আছে আমি করিনা । প্রফেশন্যালস্ আছেন । আমি শুধু শেষবেলায় চোখ বুলাই ।

আর অঙ্কের অত রস নিঙরাতে আমি পারিনা , আপনি সেই দিক দিয়ে লাকি।

শকুন্তলার এইসব আলোচনা ভালই লাগে আর মাধব খুব বিনয়ী। কারো মুখের ওপরে সহজে খারাপ কথা বলেনা। শকুন্তলার একটা গাট ফিলিং হচ্ছে যে এই কুর্গের ওপরে একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। একটা কবিতাও লিখে ফেললো সে : কূর্গের ওপরে। ছাপাও হল একটি লোকাল ইংরেজি পত্রিকা –ক্লাউড নাইনে।

সেটা পড়ে দু একজন মানুষ ঈষৎ চমকিতও হল। যারা জানে যে ওর লেখা অনেক সময়ই ফলে যায়। শকুন্তলা ধ্যানও করে। তবে কোনো ভিশন আসে বলে শোনা যায়নি।

মাধবকে সে একদিন নেমতন্ন করেছিলো। পুরনো গন্ধ মাখা কাঠের বাড়িতে বসে কতনা কূর্গি রান্না খাওবার চেষ্টা করলো। মাধব অবশ্য বেশির ভাগই প্রত্যাখান করে নানা আছিলায়। বলে : আপ রুচি সে খানা পর রুচি সে পেহেন না !

শকুন্তলা ভীষণ হেসে ওঠেন। তাকে হাসতে দেখে মাধব অবাক হয় --একি এতে এত হাসার কী আছে ?

হাসবো না ?

– কেন ?

ওমা ! পর রুচি সে পেহেন নার তো একটা লিমিট আছে ! কেউ যদি বলে জন্মদিনের পোশাকে বেরিয়ে যাও সে কি সম্ভব নাকি ?

তার রসিকতায় মাধবও হেসে ওঠে। সত্যি আপরুচি সে খানা আর---নাহ্ পর রুচি সে কিছু কিছু পেহেন না ---হা হা হা ! নিজের মনে হেসে ওঠে আবার সবার অলক্ষ্যে।

# ১৬

যোসেফের ছেলে বিদেশে থাকে । নিজের কমিউনিটির মেয়ের সঙ্গে থাকে । মেয়েটি মাঝখানে ভারতে এসেছিলো যোসেফের নাতিকে নিয়ে । এখানকার হাল হকিকৎ দেখে সে প্রায় মূর্ছা যায় ।একটা ঘরে ১০জন থাকছে , পোকা মাকড় , নোংরা মানুষজন , একটা বাসে প্রায় ১০০জন লোক ট্র্যাভেল করছে কেউ কেউ দরজা দিয়ে পড়ে যাচ্ছে । এসব দেখে মেয়েটি আহত । সে অল্প কিছুদিন পরেই পলায়ন করে নিজের সন্তানকে নিয়ে , সন্তানকে বাঁচাতে । এবং যোসেফকেও বলে এখান থেকে পালান যদি বাঁচতে চান । কিন্তু এই যোসেফ সেই যোসেফ নয় । এর ভারতীয় দর্শনের ছোঁয়া লেগেছে । সেই পরশ দিয়েছেন তান্ত্রিক বাবা । কাজেই যোসেফ আর দেশান্তরী হবেনা । যে যাই বলুক । এখন ভারতই তার স্বর্গ ভারতই তার মর্ত্য ।

সেই ভারত যেখানে আবিষ্কার হয়েছিলো শুন্য । যেই শুন্যের ওপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান । কম্পিউটার ।

সেদিন সকাল থেকেই ছিল মেঘলা। কুর্গের আবহাওয়া আরো বেশি শীতল।

পাখির ডাক কমে এসেছে। হালকা নীলের জায়গায় ঘন মেঘ। সুবাসিত বাতাসে হিমের গন্ধ। দেবদারু, ওক, অর্কিডের ছায়ায় আরেকটা পাহাড়ী দিন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। কেজো মেয়েরা কেউ কেউ আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছে। সঙ্গে ঝুড়ি, কোদাল। কফি শবদটা আগে একটি ওয়াইনের নাম ছিলো। বিশ্বের সব চেয়ে বেশি রপ্তানি হওয়া দ্রব্য পেট্রলের পরেই কফির স্থান। সেই কফির দেশ কূর্গ!

আজ সুন্দর আবহাওয়ায় কূর্গের সাধারণ মানুষ মোটর বাইক নিয়ে ইতিউতি ঘুরছে। অনেকটা বিন্দাস হাবভাব, কাজে মন নেই। যেন আজ এই শীতল হাওয়া বয়ে এনেছে ক্যাজুয়াল সুর। কুশল নগরের দিকে তিব্বতী শিশুরা রাস্তায় আইসক্রীম এর বদলে আজ অন্য কিছু খেতে খেতে চলেছে। তাদের রঙীন পোশাকে অন্য ঢেউ খেলে যাচ্ছে পাহাড়ে। শকুন্তলা একটি যুবককে আলদা পেয়ে জানতে চেয়েছিলো : তোমাদের এখানে থাকতে কষ্ট হয়না?

ছেলেটির নাম : গোরাং। ও হেসে বলে : হ্যাঁ তা তো হয়ই।

ছেলেটি ভালো কূর্গী বলছে। ও বলতে থাকে। তিব্বত তো আমাদের দেশ সেখানে আমি তো কোনোদিন যাই নি। আমার পূর্বপুরুষরা ওখানে ছিলেন। তারাই এখানে এসেছেন। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু চৈনিক সরকারের ঝামেলায় কোনোদিন যেতে পারবো কিনা সন্দেহ।

গোরং ধ্যান করে। তাতে অনেক উপকার পেয়েছে। ও কর্মযোগীও বটে। নিষ্কাম কর্ম করে। মানবতার জন্য কর্ম করে। তাই কর্মযোগী। বলে : আমি কোনো কাজ থেকে আনন্দ কিংবা বেদনা পাইনা।

শকুন্তলাও ওকে উৎসাহ দেয়। একটি তাজা ছেলের এত বোধ ভীষণ ভালোলাগে।

গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তির সামনে বসে ও ধ্যান করে। প্রদীপ জ্বালায় সবার মঙ্গল কামনায়। মাঝে মাঝে অবশ্য সে খেতে যায় বন্ধুদের সঙ্গে শহরে হোটেলে , চাউমিন আর চপসুই খায় , লাজুক মুখ করে বলে ওঠে।

তান্ত্রিক বাবাকে সে দেখতে গিয়েছিলো একবার সেই বললো।

বললো : ওঁনার মত আমাদের মত সব একি দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধ হওয়া কিংবা সো অহম।

তান্ত্রিক বাবা কাশ্মীরের শৈব তন্ত্রে সাধনা করেছেন। উনি বলেন : আসল তান্ত্রিকের অর্থ হল যিনি সেই শিবে মিলে গেছেন। মানে আই অ্যাম দ্যাট বোধে অবলুপ্ত হয়েছেন। সেই পথে যাবার বিভিন্ন পথ। তন্ত্র , মন্ত্র , বৌদ্ধ যোগ সাধনা , ইসলামের মতে তপস্যা। সবই একই পথে নিয়ে যায়। আজকাল তন্ত্রে কমার্শিয়ালাইজেশন হচ্ছে। যা এই বিদ্যার সর্বনাশ করছে। অল্প কিছু সিদ্ধি পেয়ে লোকের জন্য মিরাকেল করে সাধক সাধনার পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। অন্যের সমস্যা নিজের ওপরে নিয়ে নেন সাধক তাতে সাধনার ক্ষতি হয় ! আর আছে কিছু ভন্ড তান্ত্রিক যারা লোকের উপকারের বদলে ক্ষতি করে। প্রকৃত তান্ত্রিক কারো ক্ষতি করেনা।

–কিন্তু আপনাদের হিন্দুদের এই বর্ণাশ্রম প্রথা মারাত্মক।

– হা হা হা , সোয়ামিজির দরাজ দিল হাসি। তারপরে , জানো তো আমাদের এই প্রথা লোক মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হত। কিন্তু এখন দেখো ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ বলে প্রতিষ্ঠিত। তখনকার দিনে

কাজের মাধ্যমে তার বর্ণ নির্ধারিত হত । আর এই দ্রাবিড় অঞ্চলে তো বর্ণাশ্রাম ছিলো না । আর্যরাই একে বহন করে এনেছে বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন ।

চিন্ময়োয়ামিজী ওরফে বাবার সান্নিধ্য গোরাং এর ভালোলাগে । ভালোলাগে ওঁনার বিনম্র স্বভাব । একবার উনি শহরে এক ভক্তের কাছে এসেছিলেন । সেদিন প্রচন্ড দুর্দিন। আকাশে ঘনঘটা । বাবা রাতে তলাকাবেরীতে ফিরতে না পেরে ওখানেই থেকে যান । বারান্দায় শোবার আয়োজন করেন । ভক্ত বাধা দেয় । বলে : সোয়ামিজি ভিজে যাবেন !বাবা হেসে প্রতিবাদ করেন । তারপরে বলেন: চিন্তা করিস না বৃষ্টি হবেনা । এবং সত্যি তুমুল বৃষ্টি থেমে গিয়ে আবহাওয়া হালকা হয়ে গেলো । পরের দিন বাবা যাবার পরেই আবার তুমুল বৃষ্টি । ঘোর ঘনঘটা যাকে বলে ।

গোরাং এসব জানে । তাদের বৌদ্ধ্য তন্ত্র আছে । লাল তারা , কালো তারা , সাদা তারা , সবুজ তারা -- তিব্বাতী ভাষায় : Jetsun Dolma , মহিলা বুদ্ধ --মাঝে মাঝে ভাবে মনাস্ট্রি ছেড়ে বেরিয়ে এলে কেমন হয় ? তাদের লামাও একই কথা বলেন তো : সব নদী মেশে গিয়ে মহাসমুদ্রে । পথ ভিন্ন । তবে ?

"The more we train to see ourselves as such a meditational deity,
the less bound we will feel by life's ordinary disappointments and frustrations.
This divine self-visualisation empowers us to take
control of our life
and create for ourselves a pure environment
in which our deepest nature can be expressed."

*Lama Yeshe*

ওম মণি পদ্মে হুম ছেড়ে যাবে কি সে সোয়ামিজির পথে ? চিন্নাসোয়ামিজির মতন তাদের মঠের কেউ তাকে টানে না – কোনো লামা না। বড় শান্তি পায় সে ওঁনার সংস্পর্শে । ভাবছে সে একমনে যে চলে যাবে কি সে তাদের মতে সবুজ তারার সাধনায় – ফিমেল বুদ্ধের সন্ধানে ? দেখা যাক , দেখা যাক । দেখা যাক একদিন সে চিন্নাসোয়ামিজির কাছে কিছু গুহ্য বিদ্যা রপ্ত করতে যায় কিনা শেষ পর্যন্ত ।

# ১৭

সেদিন মাধবের সামনে সব বাঁধন খুলে গেলো । ঝিরি ঝিরি বাতাসে চাঁদ বেরিয়েছিলো বেড়াতে । আজ তার চেম্বার বন্ধ । সকাল থেকেই পাখির কলাকাকলি আর মিঠেল বাতাস মনটাকে বড় রোমান্টিক করে দিলো । চাঁদ হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের উঁচু নিচু চড়াই উৎরাই ভেঙে চললো অজ্ঞাত গন্তব্যস্থলে । কারণ আজকে তার খুব এলোমেলোভাবে ঘুরতে ইচ্ছে করছে । কোনো প্ল্যান নেই , প্রোগ্রাম নেই শুধুই উদ্দেশ্যহীনহয়ে ঘোরা । এমন সময় দেখলো বিরাট ল্যান্ড ক্রুজার নিয়ে হর্ণ দিতে দিতে মাধব আসছে । সেও আজ ছুটি মুডে । চাঁদকে দেখে বিশাল গাড়িটা যার ছাদে ওঠার সিঁড়িও আছে, একপাশে রেখে নেমে দাঁড়ালো ।

তারপরে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলো : কোথয় যাওয়া হচ্ছে পুণম ?

এই পুণম ডাকটা শুনলেই বুকের ভেতরে কেমন শিরশির করে !

চাঁদও পাল্টা হাসি হেসে বলে : বিশেষ কোথাও না জাস্ট ঘুরছি । ভালোলাগছে , এই আবহাওয়া ।

মাধব বলে : তাহলে এক কাজ কার যাক যদি আপত্তি না থাকে , আমিও এমনিই ঘুরতে বেরিয়েছি , চল আজ বরং আমরা ইরুপ্পু ফলসে ঘুরে আসি । দুপুরে বাইরে কোথাও লাঞ্চ করে নেবো । এগ্রিড ?

চাঁদ অল্পক্ষণ কিছু ভাবলো তারপরে ভাবলো মন্দ কি ? একাই তো পথে পথে হেঁটে বেরাচ্ছি ! বরং একজন চেনা সঙ্গী ( এর বেশি কিছু সে আজও ভাবেনা ) থাকলে ভালই হবে । আর ইরুপ্পু ফলস্ ভারি মনোরম স্থান । বারবার যেতে মন চায় ।

মাধব বেশ খুশি হল বোঝাই গেলো । চাঁদ গাড়িতে উঠে বসলো । মাধব দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলো । তারপরে ওর পাশে ড্রাইভারের সীটে উঠে বসলো । মাধবের এটা ছাড়াও একটা হন্ডা সিটি , একটা শেভরলে অপ্ট্রা আর একটা রেভা আছে । রেভা হল ব্যাটারি অপারেটেড গাড়ি । দূষণ মুক্ত । ছোট টু সিটার ।

অল্প দূরত্ব যায় । আশেপাশে যেতে হলে সে রেভা ব্যাবহর করে ।

তবে সবচেয়ে প্রিয় এই ল্যান্ডক্রুজার ।

চাঁদের বেশ লাগে মাধবের পাশে বসতে । মাধব খুব ভদ্র । নম্র ও জ্ঞানী ।

খুব রোমান্টিক । আগেও কয়েকবার ওর পাশে বসেছে তবে আজ যেন বেশি ভালোলাগছে । সিডিতে বাজছে ইয়্যানির ওয়ান ম্যান্স ড্রিম । খুব সুন্দর মিউজিক ।

নব প্রস্ফুটিত প্রেমের কুঁড়ির সুবাদে পথ রহস্যময় । বাতাসে রোমান্স তরঙ্গ ।

যেতে যেতে পৌছালো ইরুপ্পু ফলস্ । গেটের কাছে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ পার হয়ে কাঠের সেতু । সেতু পেরিয়ে ঐপাশে পাথরের খাঁড়া অনেকগুলি ভেজা ভেজা সিঁড়ি বেয়ে মূল ঝর্ণা । বনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলে গাছে ঢাকা ঝর্ণা চলে সঙ্গে সঙ্গে । কুল কুল মিঠে কলতান বড়ই আনন্দ দেয় । নাম না জানা পাখি ডাকে । অচেনা কোনো জন্তুর ডাকও ভেসে আসে ।

প্রথম ধাপের পথটা বেশ সোজা । সমস্যা ব্রিজ পেরিয়ে । পাথরের সিঁড়ি এত খাড়া যে চাঁদের উঠতে অসুবিধে হচ্ছিলো । যদিও সে এই পাহাড়ি অঞ্চলে থেকে থেকে পাহাড় চড়ায় অভ্যস্থ হয়ে গেছে তবুও একটু কষ্ট হচ্ছিলো । কষ্ট লাঘব হল মাধবের পরশে । সে ওর হাতটা ধরে নিয়ে চলতে লাগলো । কোথাও কোথাও ওকে লিফট্ করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো ।

দু একটা বনলতা পথের ওপরে নুয়ে আছে অজ্ঞাত লাজে । বাতাসে দোলা খাচ্ছে : ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে , আমি বনফুল গো !

বহু পুরনো বাংলা গান গেয়ে উঠছে দক্ষিণী বনলতা । ছোট ছোট রং বেরংয়ের পুষ্পে ভরা । পাশে কলম্বনা ঝোরা । উদ্দম ।পাথরে পাথরে ঠোকা খেয়ে এগিয়ে চলেছে আপন মনে , অভিমানে ।

বেশ কিছুটা হেঁটে মূল ঝর্ণা । সেখানেও একটি ব্রিজ । ব্রিজে দাঁড়িয়ে ছুঁয়ে দেখো পাগলা ঝোরাকে । অসম্ভব সুন্দর । তনুভরি যৌবন তাপসী অপর্না – ঝর্ণা !

ছন্দের জাদুকর সত্যন্দ্র নাথ দত্তের কবিতা আবৃত্তি করলো মাধব ।

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা

অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক বর্ণে , গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তল কর্ণে –

লাইনটা ঠিক বললাম তো ? মাধব জানতে চায় ।

–ভালো লোককে জিজ্ঞেস করেছো । আমি এসব সাহিত্যের কিছুই তেমন জানিনা ।

মাধব হেসে ফেলে । তারপর চাঁদ বলে : আর কয়েক ছত্র ভুল হলেই বা কি ?

এখানে তো একটাও বাঙালী নেই কে শুনছে ? তুমি বরং আরো জোরে জোরে কিছু ভুল ভাল লাইন আওড়ে যাও । বেশ একটা এফেক্ট হচ্ছে আবৃত্তির , দেখোনা কত পাখি উড়ে আসছে ।

সত্যি তো অনেক গুলো সুন্দর সুন্দর পাখি উড়ে এসে বসলো ব্রিজের রেলিং এ।

কয়েকটার ডাক খুব মিষ্টি যেন কেউ মিহি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে ।

আর ওপাশে তীব্রবেগে ঝরছে উত্তাল ঝর্ণা । সফেদ জলরাশি মুখে চোখে এসে লাগছে । জলকণা বাসা বাঁধছে চুলে । হিমেল একটা আমেজ । আশ্চর্য তো । আজ একটাও টুরিস্ট নেই এখানে।যেন আগে থেকেই তারা জানতো যে এখানে ভিন্নতর কোনো , পরিণত কোনো রোমান্সের হাওয়া উড়তে চলেছে । সাধারণত: এখানে অনেক প্রেমিক প্রেমিকা বেড়াতে আসে তারা কেউ আজ নেই । মাধবের তর সইলো না । বুনো বাতাস আর পাগলা ঝোরা তাকে পাগল করে দিলো ।

সে আসতে আসতে চাঁদের দিকে এগিয়ে এলো । চাঁদ যেন এই সমর্পণের মূহুর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলো । সেও নিশ্চুপ । মাধব

নিচু হয়ে চাঁদের ঠোঁটে চুমু খেলো । তারপরে তাকে জড়িয়ে ধরলো । চাঁদের অবশ লাগছে ভালোলাগায় ।

নিজের থেকে পা দুটো কেমন সরে যাচ্ছে । তারপর এক অফুরান মুহূর্ত । মাধব বোধকরি কিছু বুঝতে পেরেছিলো , সে তাকে লিফট্ করে নিয়ে ঘন জংগলের দিকে চলে গেলো । প্রকৃতির আদিমতার মাঝে মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি যেন বেশি করে খুঁজে পায় । চাঁদের দেহ থেকে খসে পড়ে একের পর এক পাতা । নিরাবরণ হয়ে সে ঈষৎ লাজুক চোখে চাইলো মাধবের দিকে ।

মাধব বীরদর্পে ওর নগ্ন দেহ কোলে তুলে নিয়ে হারিয়ে গেলো সবুজ বনানীর অন্তরালে । সেই প্রথম মানুষ আদমের মতন । আদম ইভ , মাধব ও তার পুণম- চাঁদ ! প্রকৃতি ও পুরুষ । ঘন বন ও বুনোফুল । প্রেম এক অবিনশ্বর বন্য প্রেম ।

জেগে ওঠে দুটি পরিণত বয়সের মানুষের মনে ও শরীরে !

কায়াহীন প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই রে - বলেছিলো চাঁদের বান্ধবী পুতুল সেন ।

শুধু মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় আমি বিশ্বাস করিনা । দৈহিক মিলন না হলে সেই প্রেম আবার প্রেম নাকি ? ও তো পুতুল খেলা ! স্রেফ পুতুল খেলা ।

আজকে চাঁদ সেই প্রেমে পূর্ণতা আনতে চলেছে সবুজ সবুজ অরণ্যের মধ্যে ।

ও ভীষণ উত্তেজিত । ভীষণ ।

যদিও পুরুষের দেহ স্পর্শ এই তার প্রথম নয় আগেও করেছে কিন্তু এবার যেন একটু বেশি লজ্জা করছিলো ।

তার স্খলিত বসন উড়িয়ে নিয়ে গেলো আনমনা বাতাস । শাড়ি গিয়ে ঝুলে পড়লো ঝর্ণায় । মাধবের পৌরুষও খুব স্নিগ্ধ । সে কামড়ায় না , খামচায় না । খুব নরম মনের মানুষ সে । সেক্স করার সময় কবিতা বলতে সে কোনদিন কোনো পুরুষকে দেখেনি । অবশ্য দেখেছে মাত্র আরেকজনকে তবে এমন কারো কথা শোনেনি ।

তোমার পদ্ম ফুলের মতন নরম উরু সন্ধির সিঁথিতে ,

কৃষ্ণ কালো বনবীথিতে

আমার হবে হোরিখেলা

ভাসাবো প্রেমের ভেলা --

মাধব ছোট ছোট কবিতাই লেখে । এই স্বরচিত ইন্সট্যান্ট কবিতা বলেই সে ডুবে গেলো চাঁদের উরুসন্ধির গহ্বরে ।

বুদ্ধদেব গুহর রচিত এই উরুসন্ধির সিঁথি কথাটা বহুদিন ধরেই মাধব কোথাও ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ভাবছিলো । সুযোগ যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে সে ভাবেনি । আজ সকালেও যখন বেরিয়েছিলো গাড়ি নিয়ে অজানার দিকে তখনও কি জানতো আজ তার জীবনের এক মধুময় অধ্যায় ঘটতে চলেছে । চাঁদকে সে ছুঁয়েছিল কিন্তু এইভাবে মিশে যায়নি কখনো , এর আগে ।

মাধবের মেল হার্ডনেস চাঁদ অনুভব করছে । তার ভীষণ ভালোলাগছে । প্রথম দৈহিক সম্ভোগের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি । দুটি দেহ একাকার হয়ে যাচ্ছে , প্রকৃতির কোলে আজ ওরা অসম্ভব সাহসী যা মানুষের মাঝে হয়ে ওঠেনা এখানে আড়ালে এসে যেন সেই সুধা সবটুকু চেটেপুটে খেতে চাইছে , মাধব ও তার মাধবীলতা চাঁদ , ওরফে পুণম , মাধবী রাত । বনের মাতাল

হাওয়া এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে তাদের নির্জন নগ্নতা । দুরে ঝর্ণার জল ডাকছে আয় আয় ধুয়ে যা সব ক্লেদ , মনের ক্লেদ , কর্দমাক্ত অন্তর । ভালোবাসার আবার শীলমোহর লাগে নাকি ? দেহের সঙ্গে দেহের মিলন সুন্দর হয় মনের মিলন হলেই ।

ঝর্ণা কত জানে । ঝর্ণা যা বোঝে সমাজ বোঝেনা কেন ??

সবুজ বনানীর মাঝে শায়িতা এক মধ্য দিনের নারী । তার অনাবৃত গোলাপী জঙ্ঘায় পড়ে আছে দু একটি বুনোফুল , এ প্রকৃতি , এই তো নারী !

মাধব কি জানতো ?

তা নাহলে সে পকেট থেকে একটি ভেলভেটের ছোট কৌটো বার করে এগিয়ে যাবে কেন ? বার করে দেয় একটি বহুমূল্য হীরের আংটি । রেখে দেয় চাঁদ ওরফে তার পুনমের উরুসন্ধির সিঁথিতে ! অবিনশ্বর প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে ।

মৃদু স্বরে চির রোমান্টিক মাধব বলে : তোমাকে আমি পুর্ণ নগ্নতা মাখিয়ে নিয়ে আসবো এখানে । এক পুর্ণিমার রাতে ! ঝর্ণায় তোমায় স্নান করাবো , আদিম রূপে তোমায় দেখবো চাঁদনী রাতে , জোছনা মেখে কেমন লাগে ! পুনম পুনম ------!

কূর্গ থেকে ইরুপ্পু ফলস্ অনেক দুর । ফেরার পথে মাধব জিজ্ঞেস করলো :

হ্যাভ ইউ এনজয়েড্ ইট ?

চাঁদ সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ে ।

তাহলে আমাদের নেক্সট ক্রিকেট ম্যাচ কবে ?

চাঁদ ভারি লজ্জা পেয়ে যায়। চুপ করে থাকে। তখন মাধব বলে ওঠে :

তুমি কী চাও পুণম ? স্বীকৃতি নাকি অন্য কিছু ?

চাঁদ মুখ ফসকে বলে ফেলে : আমি তোমার সন্তান চাই মাধব ! তোমার মতন নম্র , ভদ্র , জ্ঞানী , সুন্দর এক সন্তান !

মাধব চুপ করে শোনে। সে আগে থাকতো চেন্নাইতে। সেখানে তার স্ত্রী পুত্র সবই ছিলো । সুখেই ছিলো সে । আই আই এম আহমেদাবাদ থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ করে খুব বড় চাকরি করতো। সংসারকে সময় দিতে পারতো না তার চাকরির কমিটমেন্ট এতই ছিলো। তার একাকিনী স্ত্রী পুত্রকে কোলে নিয়ে অনেক দিন সহ্য করেছিলো এই একাকীত্ব । শেষে একদিন সে আত্মহত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকেও বিষ প্রয়োগ করে মেরে যায়।

মাধব তখন ছিলো সুদূর ইতালিতে। ফিরে এসে সে খুবই দু:খ পায়। এরপরে সে চেন্নাই এর পাট তুলে কিছুকাল বিদেশে কাটায় তারপর অচিন পুর কূর্গে এসে সে ব্যাবসা ফেঁদে বসে। ফুলের ব্যবসা। কারণ তার স্ত্রী অনুপমা খুব ফুল ভালোবাসতো। চাঁদের কাছে সন্তান চাই শুনে সে একটু থমকে গেলো।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে : কূর্গে যে থাকো বাঙালী খানা তো মেলা ভার। শুকনো সবজি আর বুনো সব জিনিস। কি খাও ?

চাঁদ একটু অবাক হয়। তারপরে বলে : হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ?

মাধব হেসে ওঠে – নাহ্ এমনিই।

আমি সম্বর ডাল রান্না করি তাতেই সব সবজি দিয়ে দিই । আর অন্যসময় এদের মতন করে কারি পাতা দিয়ে মাংস রাঁধি। আমি

ওগুলো ভালই খাই। বাঙালী খাবারের প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ নেই।

আসলে চাঁদের এখন বেশ বিরক্ত লাগছিলো। একটা সুন্দর মূহুর্তে খাবারের কথা বলার মতন উজবুক মাধব নয়। তবে কি সে সন্তান চায়না ? চায়না কোনো বন্ধন ? শুধুই টাইম পাস ?

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা ভেসে এলো তার মনে।

তোমার এই দিকটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে চাঁদ। তুমি খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড।

গাড়ি হাওয়ার গতিতে এগিয়ে চলে গন্তব্যে। বাইরে দিনান্তের বিষন্নতা।

গাছের শাখায় শাখায় ফিরতি পাখির ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা।

# ১৮

বব তো গ্রাফিক্সের কাজ করে। অ্যাডোবি ফটোশপ খুলে কাজ করে। মায়া খুলে মানুষ বানায়। সিডনি শেলডনের একটি থ্রিলার পড়েছিলো। সেখানে কম্পিউটার গ্রাফিক্স সম্পর্কে এত ডিটেলস দেওয়া যে মনে হয়না সিডণি শেলডন কোনোদিন গ্রাফিক্স এর কাজ করেন নি। অথচ ও বাবার কাছে শুনেছে যে অনেক বাঙালী লেখক তাঁদের লেখায় ভুল তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁদের কাছে অস্ট্রোনমারো বিজ্ঞানী আর ডাক্তারও বিজ্ঞানী। লোকে বলে ববের গ্রাফিক্সের হাত খুব ভালো।

ওর গ্রাফিক্স কথা বলে। এক একটি গ্রাফিক্স যখন বাঁধিয়ে রাখে মনে হয় চরিত্রগুলো সোজা নেমে আসছে ড্রয়িং রুমে। অনেকে তো কম্পিউটার গ্রাফিক্স মানে বোঝেনা। তাদের কাছে ওগুলো হাতে আঁকা ছবির মতন। আদতে তা নয়। বব অনেককে বুঝিয়েছে। ওগুলো সফট ওয়্যারের কারিকুরি। বিভিন্ন এফেক্ট দিয়ে তৈরি হয় একটি পুর্ণ চিত্র। সবই টেকনোলজির খেল। অঙ্ক বিশারদ শকুন্তলা দেবী বলেন : ম্যথেমেটিক্স দিয়ে ছবি আঁকা!

তা বটেই । পেছনে তো চলছে অঙ্কের জটিল খেলা । বাইরে দেখা যাচ্ছে ছবি , রং আর কতনা স্বপ্ন ।

ববের সঙ্গে ইদানিং রফিকের মনোমালিন্য হচ্ছে কারণ রফিক বাইরে যেতে চায় ওর খাবার খাওয়ার দক্ষতায় প্রফেশন্যালিজম আনার জন্য । বব রাজি নয় । ওদের তো শুধু দৈহিক সম্পর্ক নয় ওরা স্বামী স্ত্রীর মতন থাকে । পরস্পরের প্রতি একজন নর্ম্যাল স্বামী স্ত্রীর মতনই টান আছে । অন্তত ববের আছে । হলই বা রফিক পুরুষ সে তো ওর সুখ দু:খের সঙ্গী । তাকে সে নিজে বেটার হফের মতনই ভালোবাসে ।

কাজেই তার বিরহ সহ্য করা মুস্কিল । রফিক যে ধান্দায় যেতে চায় তা নয় কিন্তু গেলে ওর ঐ বিশেষ প্যাশনে সুবিধে হবে । এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বাক বিতন্ডা চলেছে । তবে রফিক এই টুকু বুঝছে যে সেও বব বিনা সুখে থাকবে না ।

ববের জ্বর হলেই ওর অন্তর কাঁদে সেখানে এত দূরে গিয়ে সে ওকে দিনের পর দিন না দেখে স্রেফ ইমেল আর চ্যাটের ভরসায় কী করে থাকবে ?

সেদিন বিকেলে ও ববের জন্যে এক বাক্স কেক আর একটা খুব সুন্দর বোকে নিয়ে এসেছিলো ।

তাই দেখে বব মুখ ভেচকে বলে ওঠে : হঠাৎ ? বাটারিং করছো ?

ওরা দুজনে দুজনকেই তুমি করে অ্যাড্রেস করে ।

রফিক ওকে আলতো চুমু দেয় । বব সরে যায় ।

–কি করে তোমায় এখানে আমি আটকে রাখতে পারি বলো ?

ববের প্রশ্ন শুনে রফিক মাথা নাড়িয়ে কি বলে খুব আস্তে শোনা যায়না।

ততক্ষণে সে বারান্দায় চলে গেছে। তারপর কিছু ভেবে সে ফিরে আসে। এসে বলে : একটা প্রস্তাবে যদি রাজি হও আমি খাওয়ার এই প্রতিযোগিতায় যাওয়া ছেড়ে দেবো।-

কী প্রস্তাব , বলো , ভেবে দেখি।

হ্যাঁ ভেবে দেখতেই পারো ডার্লিং , টেক ইওর টাইম।

বলো শুনি রফি। দেখি রাজি হবার মতন কিনা।

আমরা কি পারিনা একটা অনাথ শিশুকে দত্তক নিতে ?

অনাথ শিশু ? ববের চক্ষু ছানাবড়া।

হ্যাঁ ,তা এতে অবাক হবার কি আছে ?

অবাক হবনা ? একটা অনাথ শিশু আমরা কোথায় পাবো ?

কেন অনাথ আশ্রমে।

অনাথ আশ্রমের লোকেরা আমাদের দেবে কেন ? ভারতে আমরা ব্রাত্য তা তো তুমি জানো।

জানি কিন্তু আমরা যে কেউ একজন ওকে দত্তক নেবো। কেন অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন তো নিয়েছেন।

বব কিছু ভাবে তারপরে বলে - এই মূহুর্তে কিছু ভাবতে পারছি না আমি। তুমি আমাকে কিছুদিন সময় দাও রফি। সময় দাও।

ওকে বস টেক ইওর টাইম অ্যাজ আই সেড বিফোর।

রফিক আরো বলে যে ওদিকের কফি ব্লসমের মালিক যোসেফ নাকি বলে যে *ইন্ডিয়ানস্ আর ইমোশন্যাল ফুলস্*।

কাজেই বেশি ইমোশন্যাল হবার দরকার নেই , মাথা ঠান্ডা করে বিচার বিবেচনা করে তবেই ডিসিশন নিয়ে আমাকে জানাও।

রফিক এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। আজ হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টি পড়ছে। বেশ একটা ভেজা ভেজা ভাব চারপাশে। লাল মাটি গড়িয়ে জল বয়ে চলেছে তিরতিরে ঝর্ণার মতন।

বাতাসে সোঁদামাটির গন্ধ। ভাবতে অবাক লাগে কবির এত কাব্য , গায়কের এত গান সবকিছু যেই মিষ্টি ভিজে মাটির গন্ধকে কেন্দ্র করে তা আসলে সৃষ্টি করে কিছু জীবানু – *Actinomycetes*

রফিকের আবার পপুলার সায়েন্সে কিছু ইন্টেরেস্ট আছে। সে প্রায়ই পপুলার সায়েন্সের আর্টিকেল পড়ে যদিও ওর বিজ্ঞানি এক বন্ধু বলে যে ভালোলোকের লেখা নাহলে ওগুলো পড়বি না। কারণ অনেকেই ভুল জিনিষ লেখে।

আজকে রফিকের মনে হচ্ছে যে এই আবহাওয়ায় একটু বাইরে খেলে মন্দ হয়না। কূর্গে যদিও তার মতে খুব ভালো রেস্তোরাঁ নেই তবুও একটি হল যোসেফের ঐ এগের দোকান। সেখানে সত্যি ভালো খাবার পাওয়া যায়। ঐ দোকান না খুললে সে জানতেই পারতো না যে ডিমের এত রকম প্রিপারেশান জগতে হয়।

সত্যি যোসেফ বেশ ভালোলোক। একটা ভালো জিনিস ইন্ট্রোডিউস করেছে সে কূর্গে। নাহ্ তাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে আলাদা করে একদিন।

বুকের ভেতরে একটা ভালোলাগার স্রোত বয়ে চলে।

ইমোশন্যাল ফুল্‌স্‌ – বিড়বিড় করে ওঠে রফিক তারপর হারিয়ে যায় সোঁদা মাটির পথ ধরে সবুজ অন্ধকারে।

চাঁদের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো ববের পরের দিন সকালে। পূর্ব রাত্রের বৃষ্টি স্নাত রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিলো এক মনে। পথেই ববের সঙ্গে দেখা।

নিয়মিত কিছু খোঁজখবর নেবার পরে বব ওকে জিজ্ঞেস করে : আচ্ছা আমার কিছু আলোচনা আছে একটু সময় হবে ?

হঠাৎ কী আলোচনা ?

এই পার্সোন্যাল। সময় হবে ?

হ্যাঁ হবে তবে এখন নয় আমি একটু কাজে যাচ্ছি , বিকেলে আমার বাড়ি এসো , ডিনার খেয়ে যেও। রফিককে নিয়ে এসো আমি ওকে এস এম এস ইনভিটেশান পাঠিয়ে দেবো।

চাঁদের হাঁটা চলায় স্বচ্ছন্দ ভাব। সাজ পোশাকে আনন্দ লহরী , ও যেন এখন নতুন মানুষ। ববের চোখ এড়ায় না।

সে সম্মত হয়ে সময় জানিয়ে চলে গেলো। যথাসময়ে রফিককে নিয়ে ওর বাড়ি গেলো। সুন্দর পরিপাটি বাড়ি চাঁদের। ছিমছাম। ঢুকতেই একটা মাধবী লতা গেটে জড়ানো। কিছু অর্কিড , ফার্ণ এলোমেলোভাবে রয়েছে। ড্রয়িং রুমে অনেক ফুলের ছবি লাগানো। জানা গেলো সবই মাধবের বাগানের ফুল। বিভিন্ন সাজে বিভিন্ন বর্ণে তারা ঘরকে আলোকিত করে আছে।

মাধব বেশ ভালো ছবিও তোলে।

কত ছোট ছোট ফুলের ছবি সে তুলেছে , ঘাসফুল কিংবা বুনোফুল। সেগুলো এনলার্জ করে রাখা আছে। মনেই হচ্ছে না যে ওগুলো

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল । সব মিলিয়ে রুচিপূর্ণ পরিবেশ । আর রয়েছে হোমিওপ্যাথির অজস্র শিশি ।

গাঢ় কফি পানের পরে চাঁদ এসে বসলো কাঠের সোফায় । আজ তাকে আরো মনোরম লাগছে । সিল্কের শাড়ি পড়েছে , কানে গলায় হাতে মানানসই গয়না । ছোট্ট টিপ ।

বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে এই মধ্যাহ্নেও । কে বলবে কিছুদিন পরেই তার যৌবনে সূর্য ডুববে ! মাধবের সঙ্গে দেখাটা বড় দেরীতে হল , মনে মনে ভাবছিলো বব ।

হয়ত তাদের মতন এদেরকেও শেষমেষ একটা সন্তান দত্তক নিতে হবে ।

তা হোক ভারতে তো অনাথের অভাব নেই । যদিও আমরা সাহেবদের দোষ দিই কিন্তু আমাদের দেশে আন্ডার কাভার সবই হয় । তাই তো কত শিশুকে তাদের মায়েরা আস্তাকুড়ে ফেলে দেয় । দৈহিক সম্ভোগজাত সন্তান । তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি চাঁদ ও ববদের দৌলতে ঘর পায় মন্দ কি ? এও এক ধরণের সিমবায়োসিস !

নিজের মনেই হেসে ওঠে বব ।

একি একা একা হাসছো কেন ? চাঁদ দ্বিতীয়বারের কফির পেয়ালা এগিয়ে দেয় ।

নাহ্ এমনি । ভাবছি একটা সন্তান দত্তক নেবো আমরা দুজনে তাই তোমার সাথে পরামর্শ করতে এলাম । আর হাসছি ভেবে যে আমাদের কেউ কি দেবে সন্তান ?

আর ইউ জোকিং বব ?

নো আই অ্যাম নট ।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে চাঁদ বলে – কেন দেবেনা তবে তোমাদের ওকে মানুষ করার মতন আর্থিক বল আছে কিনা সেসব দেখবে। যাতে ওর ইন ফিউচার কোনো সমস্যা না হয়। তবে ওর বাবা আর মা কে হবে ? বলে একটু থমকে গেলো চাঁদ।

বব লজ্জা না পেয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে বললো: আমরা যে কেউ একজন ওকে দত্তক নেবো। অন্যজন অ্যাসিস্ট করবে। গে ম্যারেজ তো এখানে লিগলাইজ্‌ড্‌ নয়। তাই সন্তানকে বড় করতে হয়ত দেবেনা। কারণ আমার মনে হয় ওরা মনে করে একটি সন্তানের বাবা ও মা দুই থাকা উচিৎ। যারা তাকে মেল ও ফিমেল দুই ধরণের ব্যাবহার শেখাবে। আর গে ম্যারেজকে লিগালাইজ্‌ড্‌ করলে হয়ত সমাজে এইধরণের মানুষের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে কিন্তু সমাজ , ধর্ম এগুলোর এত ভয় কেন ? মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কি আটকে রাখা যায় ? তাকে স্বীকৃতি দিতে এত ভয় কেন আইনের ? শুধু নারী আর পুরুষ এরকম কি হয় ? নপুংসক তো প্রকৃতিরই সৃষ্ট লিঙ্গ ! বিদেশিরা তো কিছু কিছু জায়গায় এই বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে। আমরাও নর্মাল হিউম্যান বিং চাঁদ , আমরাও তোমাদের মতন নি:শ্বাস নিই , খাই , আমাদের ব্যাথা লাগে , আনন্দ হয় ! এই দেখো আমার গায়ে এই এই তোমার এই সেফটিপিনটা ফুটিয়ে দেখো , দেখো --দেখবে আমাদের তোমাদের মতন লাল রক্ত বার হয় ! তোমরা বোঝোনা কেন ?

চাঁদ একটু অকয়ার্ড হয়ে থেমে বললো :তোমরা দুজনে তাহলে বিদেশে চলে যাও।

বব চুপ করে আছে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টে বলে : আমি কিছু অনাথ আশ্রমের কথা জানি। দেখি তোমাকে ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো ইমেলে। কয়েকদিন সময় দাও।

ওকে বস টেক ইওর টাইম।

চাঁদ মিষ্টি হেসে আবার শুরু করে : জানতো বব আমি এক বিদেশিনীকে চিনতাম । আমার পেশেন্ট । উনি অনেকদিন আমেরিকায় ছিলেন । এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন । পরে এখানে এসেছিলেন বেড়াতে । এক বছর ধরে ভারতে বেড়িয়ে ফিরে যান । মাঝে অসুস্থ হওয়ায় আমার কাছে এসেছিলেন কারণ উনি ওখানে হোমিওপ্যাথি নিয়েও পড়েছেন । উনি বলছিলেন যে ওনার স্বামী যখন বিদেশ গিয়েছিলেন ওনাকে আমেরিকায় একা রেখে তখন ওনার অন্য একজনের সঙ্গে একটি সন্তান জন্মায় । সেই সন্তানকে ফেলে দিয়ে আসেন অনাথ আশ্রমে । কিন্তু আজ শেষ বয়সে পৌঁছে তার জন্য দু:খ হয় ।

চাঁদ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে : স্বামীকে ঠকানোতে দু:খ হয়না ?

তাতে ওনার স্পষ্ট জবাব : নাহ্ ওকে তো আমি ঠকাই নি । হি ওয়াজ অ্যাওয়ে ফর আ লং টাইম সো হোয়াই কান্ট আই স্লিপ উইথ অ্যানাদার গাই ?

আমার তো একটা দেহের ক্ষিদে আছে ! মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ অ্যাওয়ে দ্যাট ডাজেন মিন আই কুড নট গেট প্রেগন্যাট !

উত্তর শুনে চাঁদ আর কথা বাড়ায় নি । শুধু ছোট্ট করে : ঠিকই তো ঠিকই গোছের ঘাড় নেড়েছিলো ।

বব বলে : এরা আছেন বলেই আমাদের শখ আহলাদ মেটে ।

নাহলে আমরাই বা দত্তক নিতাম কাকে তাই না ? তুমি কবে সাতপাক ঘুরছো ? মাধবের সঙ্গে বন্ধুত্ব কতধাপ এগোলো চাঁদ ?

কতধাপ এগোলো? আর বেশিদিন নো ম্যান্স্ ল্যান্ড হয়ে থেকো না ডিয়ার ফ্রেন্ড ।

সময় কারো জন্যে বসে থাকে না।

ববের স্বর প্রতিধ্বনি আকারে ফিরে ফিরে আসে চাঁদের কানে। সে নিশ্চুপ।

সম্প্রতি রফিক চেন্নাই ঘুরে এসেছে। সেখানে সে পড়েছিলো এক অটোওয়ালার

খপ্পরে। খুব নাকানি চোবানি খাইয়েছে। মোটা ও অযৌক্তিক টাকা দাবী করে সে সওয়ারি নেমে যাবার পরে। রফিক দিতে অরাজি হওয়ায় সে তাকে নিয়ে যায় একটি গলিতে। সেখানে আরো অটোওয়ালা কে ডেকে এনে খুব মারধোর করে রফিককে। ছাড়া পাবার পর সে সোজা পুলিশ স্টেশানে যায়। কিন্তু আজব কান্ড! দেখা যায় পুলিশ হাত ধুয়ে ফেলছে। পরে জানা যায় যে ঐ অটোগুলোর মালিকানা এই পুলিশদের। ওরা ভাড়া খাটায়, অন্যায টাকা দাবী করে না দিলে ওরা সওয়ারিকে মারধোর করে নামিয়ে দেয় কোনো ব্লাইন্ড লেনে।

এই ঘটনার পরে রফিক খুব ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইরে খাবার খাবার কম্পিটিশানে যাবার ইচ্ছেটা যেন একটু কমে এসেছে আঙুরের খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া রফিকের।

বদলে ট্যাটুর নেশায় পেয়েছে তাকে। ট্যাটু বানানো শিখেছে। হাত বেশ ভালো।এতই যে ওর ৩-৪ মাসের বুকিং আগে থেকে হয়ে যাচ্ছে। আপাতত সে ট্যাটু শিল্পেই মনোনিবেশ করেছে। খাওয়া প্রতিযোগিতা ছেড়ে। তার হাত এতই ভালো যে তার সেক্স লাইফ এখন উহ্য হয়ে গেছে কুর্গের তরুণ তরুণীদের কাছে।

একজন ক্লায়েন্ট আর্মির এক্স অফিসার। এখন এখানে আছেন।

অনেকদিন উত্তর পূর্ব ভারতে ছিলেন । তার কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলো রফিক । একবার আসামের দিকে থাকাকালীন উনি খবর পান যে একটি গাড়ি করে আর্মস পাচার হচ্ছে । উনি পাহাড়ি পথে ছোট একটা ক্যাম্প বসিয়ে প্রহরা দেন । এক এক করে গাড়ি আসে । সার্চ হয় । কিছু পাওয়া যায়না । শেষে আসে এলাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি । যথারীতি সার্চ করার কথা হয় । ডি এম কিছুতেই সার্চ করতে দেবেন না । নিজের পদমর্যাদা বলে অপারেশান আটকে দেবার চেষ্টা করেন ।

কিন্তু এই তুখোড় আর্মি অফিসার রাজি হননা । বলেন :

নিজে একজন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি অফিসার হয়ে আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন ?

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় ও উনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে আর্মি অফিসারের বদলি করাবার হুমকিও দেন । অফিসার গভীর জলের মাছ । কিছুতেই ছাড়েন না । তখন ডি এম এর সাথীরা বন্দুক তোলে । তাই না দেখে একসঙ্গে লুকিয়ে থাকা আর্মি ম্যানেরা ( যাদের অফিসার লুকিয়ে রেখেছিলেন ) এ কে ৪৭ হাতে নিয়ে তাক করে ডি এমের দিকে । ভয় পেয়ে যান ডি এম এতগুলো এ কে ৪৭ দেখে অবশেষে রাজি হন এবং সার্চ করে আর্মস পাওয়া যায় ।

– হঠাৎ আপনি ওকে সন্দেহ করেন কেন ? সাধারণত এত বড় অফিসার তো এসব করবেন না !

– ঐ এরিয়া খুব সুন্দর রফিক ওখানে একটি জায়গা আছে যেখানে পাখিরা এসে কোনো এক রহস্য জনক কারণে আগুনে ঝাঁপ দেয় । জটিঙ্গা নাম জায়গাটির । আবার একই সাথে ওখানে উগ্রপন্থীরা ঘোরে , খুব সেন্সিটিভ জোন । আর আমাদের কাছে খবর ছিলো যে এইধরণের অফিসাররা উগ্রপন্থীদের মোটা টাকা দেয় । দিতে বাধ্য

হয় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে । কাজেই ওর গাড়ি করে অস্ত্র পাচার হওয়া বিচিত্র কী ?

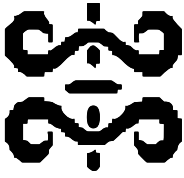

# ১৯

রফিকের ট্যাটু শিল্পের হাত খুব ভালো। এক একটি অলঙ্করণ দেখবার মতন।

বেশি করে প্রকৃতি ও নারীকে নিয়ে। বাংলার সাঁওতাল প্রজাতির হাতে ট্যাটু দেখেছে চাঁদ। কিন্তু প্রফেশন্যাল ট্যাটু দেখেছে রফিকের স্টুডিওতে। একটি মেয়ে তো সারা দেহে ট্যাটু করলো। তারপরে নগ্ন হয়ে ছবি তুললো। কিন্তু ছবিতে বোঝার উপায় নেই যে সে বস্ত্রহীনা। এতই সুন্দর হয়েছে অঙ্কন। রফিকের বেশ নাম ছড়িয়ে পড়ছে। দূর দূরান্ত থেকেও লোক আসছেন। ও সিলিকন শহর ব্যাঙ্গালোরেও একটি আস্তানা করার কথা ভাবছে। বব একদিন ওকে বলেছিলো :

রফিক তুমি নারী সঙ্গ করতে যদি ইচ্ছুক হতে তাহলে নারী শরীরে এত ধৈর্য্য ধরে ট্যাটু আঁকতে পারতে ? বিশেষ করে নগ্ন দেহে ?

রফিক নীরব দেখে বব হেসে বলে : লজ্জা পাচ্ছো ?

নাহ- ভাবছি এখনো তুমি আমাকে সাধারণ মানুষের মতন ভাবছো । তা নাহলে এই অদ্ভুত প্রশ্নটি করতে না , জানতে আমি পুরুষ শরীর বেশী ভালোবাসি ।

পুরুষের পেশি , শক্তপোক্ত গড়ন , গোঁফ , বলিষ্ঠতা আমাকে বেশি আকর্ষণ করে , নারী সুলভ কমনীয়তা নয় । পুরুষকে নগ্ন দেখলে আমি উত্তেজিত হই, নারীকে নয় ।

রফিকের কাছে একবার এক ভদ্রলোক এসেছিলেন । ট্যাটু করাতে ।

উনি ওঁনার ভাইয়ের ছোট ছেলেকে নগ্ন দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন ।

কোনদিন কাউকে ভয়ে বলতে পারেন নি । কারণ তার মনে হত এ অস্বাভাবিক । এখন মনে হয় এই অনুভূতি অস্বাভাবিক নয় স্বাভাবিকই ।

বাচ্চা ছেলেটিকে স্নান করানোর আছিলায় উনি তার যৌনাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতেন কেউ লক্ষ্য করেন নি । ভেবেছেন আদর করছেন ।

ছেলেটিকে একদিন বন্ধ বাথরুমে চেপে ধরে চুমু দিতে বাধ্য করেন । ও নিজের

উন্মুক্ত যৌনাঙ্গ ছুঁয়ে দেখতে বলেন ।

-আমি কি পেদোফাইল ?

রফিককে প্রশ্নটা করেই বসেন ।

রফিক এক মনে একটি লতা আঁকছিলো । প্রথমে শুনতে পায় নি ।

ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করায় বলে: মানুষের মন বড় বিচিত্র। কেউ যেমন পুরো সাদা নন সেরকম কেউ পুরো কালোও নন। সব জায়গায় হাজার শেডস্।

কাজেই নিজেকে ইনফিরিওর না ভেবে মানুষের জন্যে কাজ করো।

তখন লোকে তোমার প্রোফাইল দেখবে পেদোফাইল কিনা তা নয়!

ভদ্রলোক বুঝলেন এ সান্ত্বনা দেওয়া কথা। আর কথা বাড়ালেন না।

রফিককে তার বেশ ভালোলাগে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে কার সঙ্গে সেক্স করে সেটা ওর কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কূর্গ হল অস্ত্র শস্ত্রের দেশ। এখানে মানুষের কোমড়ে ছোরা ধাঁচের ছোট অস্ত্র গোঁজা থাকে। সম্প্রতি এই রাজ্যে অনেক আধুনিকতা এলেও মূল ভাবধারা একই আছে। অনেকেই ছোরা রাখে। আত্মরক্ষার জন্য। ভেঙ্কিও রাখে। সে নিয়মিত তান্ত্রিক বাবার কাছে ছোরা সমেত হানা দেয়। পথে অনেকটাই তো জঙ্গল পড়ে! অনেক গল্প হয়। ছোটখাটো অসুখে ও ব্যাথায় ওষুধ আনে। বাবা নাড়ী টিপে অসুখ বলে দিতে পারেন। অ্যালোপাথি ছেড়ে সে কবিরাজিতে বিশ্বাস রাখছে আজকাল। বাবা বলেন : ওষুধ যত পারা যায় কম খাবে। ধ্যান করবে, টেনশান ফ্রি মন হলে এমনিই অসুখ বিসুখ কম হবে। সমস্ত ওষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে। হয় তাৎক্ষণিক কিংবা পরবর্ত্তীকালে হতে পারে।

ডাবল এফ আর সি এস পাশ করা এই সন্ন্যাসীকে বড় ভালো লাগে ভেঙ্কির। উনি সাধক হিসেবে কত ওপরে অবস্থান করেন তা সে জানে না কিন্তু এক অপার শান্তি পায় ওঁনার সান্নিধ্যে। তাই তো ছুটে আসে বারে বারে।

উনি বলেছেন যে আয়ুর্বেদে এমন ওষুধ আছে যার সাহায্যে ইচ্ছেমতন পুত্র কিংবা কন্যার জন্ম দেওয়া যায়। এটা ম্যাজিক নয় খাঁটি বিজ্ঞান। ওষুধ প্রয়োগে ঐ ধরণের স্পার্ম আকর্ষণ করবে শরীর। এছাড়াও আজকের অ্যালোপ্যাথির ন্যানো টেকনোলজি আয়ুর্বেদে বহু আগে থেকেই চলে আসছে। চাঞ্চল্যকর তথ্য বাবার কাছে পেয়ে অবাক হয় ভেঙ্কি। সে বলেছে : আমরা খুব হতভাগা। আমাদের প্রাচ্যের চিকিৎসা শাস্ত্র এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা সব হারাতে বসেছি।

শিলাজিৎ। হিমালয়ের গায়ে জন্মানো আঁঠালো এক বস্তু। আয়ুর্বেদাচার্য চরক বলে গেছেন : হেন কোনো অসুখ নেই যা শিলাজিৎ প্রয়োগ করে কন্ট্রোল করা কিংবা সারানো যায়না।

যুগের সঙ্গে এসেছে নতুন নতুন ব্যাধি। কিন্তু সেই অনুপাতে ভেষজে গবেষণা হয়নি। হলে হয়ত আরো নতুন জিনিষ পাওয়া যেতো। সেকালে তো ব্রেন সার্জারি হত বলেও শুনেছে ভেঙ্কি।

চিন্নাসোয়ামিজী অর্থাৎ তান্ত্রিক বাবা মাঝে মাঝে পাবলিকলি বিনা পয়সার আয়ুর্বেদিক ওষুধ দেন শরীর সারানোর জন্যে। অনেকেই ওঁনার কাছে আসে। একজন মেয়ে নিয়মিত আসতো। তার বাড়ি বাংলায়। নাম গীতু। গীতু আসলে এখানে এসেছিলো রাঁধুনির কাজ নিয়ে। তার এক পাতানো দাদা থাকে আমেরিকায়। সেখানে সে হন্টেড হাউজ কিনে রেনোভেট করে বিক্রি করে করে বেশ ধনবান ব্যাক্তি হয়ে উঠেছে। বিয়ে করেছে এক ককেশিয়ান মেমসাহেবকে, রীতিমতন সম্বন্ধ করে –মেয়ে দেখে এসে। কিন্তু পাতানো বোন যেতে চাইলে তাকে উৎসাহ দেবার বদলে না করে গেছে। বোনের বিদেশে যাবার বাসনা প্রবল। সে যাবেই। তখন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার দেখভাল করার জন্যে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেয়। সেই ভদ্রমহিলার বাড়ি সে রান্নাবান্নার কাজ করতো। কিন্তু বেশি দিনের ভিসা পেতনা বলে

বারেবারে যেতো । একদিন ভদ্রমহিলা মারা গেলেন । গীতুর বিদেশ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো । কিন্তু বাংলার মফ:স্বলে থাকতে সে নারাজ । চলে এলো ব্যাঙ্গালোরে , তারপরে এক কফি প্ল্যান্টারের বাড়ি কাজ নিয়ে কূর্গে ।

এখন সে এখানেই থাকে । তার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সে যৌবনে প্লাঁশেং করতো । আত্মা নামাতো । যদিও বেশির ভাগ সময় মানুষ বিভিন্ন আবদার নিয়ে আসতো কিন্তু কিছুটা সময় সে নিজের জন্যেও রাখতো ।

স্বামী বিবেকানন্দের আত্মা নামানোর কথা বলতো । বলতো স্বামীজিকে সে ভালোবাসে তাই এইভাবে যোগসুত্র স্থাপন করতে চায় । স্বামীজিকে নিজের দেহদানের মনোবাসনা জানাতো ।

বন্ধুরা বোঝাতো । তারপরে একদিন একটি আঁকিবুকি কাটা খাতা পায় ওরা ।

সেখানে স্বামীজির কাঁচা স্কেচ করা আর নানান প্রেমের ছোট মোট ডায়লগ লেখা । স্বামীজি ভার্সেস গীতুর ডায়লগ ।

গীতু : স্বামীজি আমি তোমাকে ভালোবাসি ।

কাল্পনিক স্বামীজী : আমিও তোমাকে ভালোবাসি গীতে !

গীতে ! উহ্ ! উরিবাবা , উহ্ গীতে !

হ্যাঁ । ছোট্ট করে নিলাম । গীতস্টা বড্ড অ্যামেরিক্যানাইজ্ড্ । স্বামীজীর মিষ্টি হাসি ।

–আমিও তাহলে তোমাকে বিবু বলে ডাকবো কেমন । না করতে পারবে না কিন্তু ।

সে ডেকো কিন্তু আমার মিশনে মহারাজেরা জানতে পারলে তোমায় কচুকাটা করবেন। মর্ত্যে আমার একটা সুনামের ব্যাপার আছে না !

আর মর্ত্যে তোমার কে কে আছে ? কে কে বিবু ?

বিবেকানন্দ নিশ্চুপ।

শেষমেশ গলা ঝেড়ে ( প্লাঁশেতে ) বিবেকানন্দ বলেন -- কেন তুমি গীতে!

গীতু খুশিতে ডগমগ। শুন্যে চুম্বন ছুড়ে দেয় বিবেকানন্দের প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে। মিহি স্বরে বলে : কে বলে তুমি স্বামীজী নও ? প্রকৃত স্বামী তো তুমিই। তবে শুধু আমার স্বামী। বাকি সবার কাছে জী !

এরপরে শুরু হয় অশ্লীল বাক্যালাপ।

যা ছাপার বা জোরে জোরে পাঠ করার অযোগ্য।

গীতুর যৌনতার বিকৃত রূপ ও একজন মহাপুরুষকে তার সঙ্গী নির্বাচন করা

বড়ই বিচলিত করে তার বন্ধুদের। তারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবার তোড়জোর আরম্ভ করে। একপ্রকার পালিয়ে যায় সে বলে অনেকে মনে করেন। এরপরে ইংল্যান্ডে ও কূর্গেও চলতো প্লাঁশেৎ।

শেষকালে স্বামীজি রক্ত মাংসে মোটেই আবির্ভূত না হওয়ায় একদিন সে তান্ত্রিকবাবার কাছে হাজির হয়। এই গল্প ভেঙ্কি শুনেছে চিন্নাসোয়ামিজির কাছেই। মেয়েটি বাবাকে ধরে : আপনি তো যোগীপুরুষ ! আপনি কি পারেন না আমাকে বিবেকানন্দের সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিতে ? আমি ওঁনাকে ভালোবাসি । ওঁনার তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি , চেহারা আমাকে অসম্ভব আকর্ষণ করে ।

তান্ত্রিক বাবা গীতুকে আপাদমস্তক দেখলেন । তারপরে বললেন :

তুমি সত্যি ওঁনাকে পেতে চাও ? যেমন শ্রী রাধিকে শ্যামের জন্য পাগলিনী হয়ে উঠেছিলেন ?

গীতু উৎসাহিত হয়ে জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে থাকে : হ্যাঁ হ্যাঁ !

তাহলে ধ্যান করো । তাতেই তাঁকে তুমি পাবে ! বিলিন হয়ে যাবে বিবেকানন্দে ।

কিন্তু কবে ?

যতদিন না তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে । হলেই পাবে । ডিভাইন লাভ ।

ডিভাইন লাভ টাভ শুনে গীতু হকচকিয়ে যায় । মিহি স্বরে বলে ওঠে :

ডিভাইন না আমি পার্থিব প্রেমে বিশ্বাসী ।

আমি বিবেকানন্দজীকে বিয়ে করতে চাই ।

চিন্নাসোয়ামিজি বোঝেন মেয়েটির মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে ।

তারপর শুরু হয় প্রতি সন্ধ্যায় স্নেহ সিক্ত কাউন্সেলিং । একটা সময় মেয়েটি বুঝতে পারে দৈব প্রেমের মাহাত্ম্য । এবং তার কাছে বিবেকানন্দের নবজন্ম হয় ।

দৈহিক প্রেমের বাইরেও যে প্রেম হয় সে বুঝতে পারে ।

তার কৈশোর থেকে যৌবনের একটা পর্ব অবধি সে যার কাছে আশ্রিতা ছিল সেই মামা তাকে নিয়মিত ভোগ করতো। দক্ষিণ ভারতে মামা ভাগনির বিয়ে স্বীকৃত কিন্তু ও তো বাঙালী মেয়ে ! মামাও বাঙালী। এর ফলেই হয়ত তার মধ্যে কিছুটা মনোবিকৃতি দেখা দেয় ! কিছুটা পার্ভার্শন। কে জানে ! এখন সে অনেকটাই নর্মাল। তান্ত্রিক বাবার সান্নিধ্যে এসে।

গল্প শুনে ভেঙ্কি খুবই ইমপ্রেসড্। মেয়েটিকে চেনে। সে থাকে যোসেফের বাড়ির দিকে। যোসেফের ডিমের দোকানে সে কাজ করে। আজব মেয়ে , আজব পরিবর্তন। কত রকমের মানুষ যে দুনিয়ায় আছে মনে মনে ভাবে ভেঙ্কি।

তার নিজের মেয়েরই তো এক রূপ দেখলো সে। এখন সোয়ামিজিই তাকে যা আনন্দ দিতে পারেন , তন্ত্র মন্ত্র বলে।

কূর্গে তো বাঘ আছে তা সর্বজন বিদিত ঘটনা। এক সোনাঝরা সন্ধ্যায় সেই বাঘের ডাক শুনে ছুট্টে যায় ঘরে , গীতু ! যোসেফের দোকানে সে ডিম ভাজছিলো।

সবে সূর্য ডুবেছে। বাতাসে সামান্য হিমেল সুর। এমন সময় ঠিক ঘরের কাছেই গর্জন। এক লাফে গীতু ঢুকে যায় ভেতরে , রান্নাঘর থেকে। ভেঙ্কি সেদিন ওখানে ছিলেন।

গীতুকে লাফ মারতে দেখে ভেঙ্কি এগিয়ে আসেন। ভয়ে মেয়েটি কাঁপছে।

কি হয়েছে গীতু ? ভেঙ্কির ভারী কণ্ঠস্বর গম গম করে ওঠে।

বা-আ-আঘ ! বা-আ!

কোথায় ?

ভয়ার্ত চোখে সে বাইরের দিকে আঙুল দেখায়। ভেঙ্কিও একটা ডাক শুনেছে তবে বাঘের ডাক কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় নি কারণ সে উচ্চগ্রামে টিভি চালিয়ে বসে ছিলো।

যোসেফও এলো। সেও একটা ডাক শুনেছে কিন্তু কী হয়েছে বোঝার জন্য দোতলা থেকে নেমে আসে।

বাঘ বাঘ বলে ভেংকি বাইরের দিকে আঙুল দেখালো।

এমন সময় হঠাৎ একজন বন্দুক ধারীকে কফি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। জলপাই পোশাক। মাথায় টুপি।

হাতে এ কে ৪৭।

কোথায় বাঘ ?

এ তো মানুষ !

ভেঙ্কি একলাফে বাইরে গিয়ে লোকটিকে উদ্দেশ্য করে চীৎকর করে ওঠে :

কে তুমি ? এখানে কী করছো ?

লোকটির কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। সে কফি বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তখন ভেংকি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে পেছনে থেকে লোকটিকে আক্রমণ করে। বক্সারের এক ঘুষির ধাক্কায় লোকটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন ভেঙ্কি ওকে জাপটে ধরে। ইতিমধ্যে এসে পড়ে যোসেফ। দুজনে মিলে লোকটিকে কাবু করে মাটিতে ফেলে দেয়। কেড়ে নেয় বন্দুক। ভেঙ্কি বার করে লুকানো ছোরা। আঘাত হানার তাগিদে। যোসেফ বাধা দেয়। বলে : আইনে নিজের হাতে নিতে নেই।

ববের বেশির ভাগ কাজই তো হত কম্পিউটারে। সেদিন বিকেলে সে একটি ইমেল পায়। ইমেলটি ভুল করে তার মেলবাক্সে চলে এসেছিলো।

ইমেলটিতে লেখা ছিলো :

*কুর্গে আজই শেষদিন। আজকেই বেরোতে হবে। আক্রমণ করতে হবে মনাস্ট্রী, চার্চগুলি। চার্চে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, নৃশংসভাবে মারতে হবে পাদ্রীকে।*

*শুরু হোক ২২জে সি বি থেকে। জয় হিন্দ!*

কোডটা না বুঝলেও এটা বোঝা গেলো যে কোন টেররিস্ট অ্যাটাক হতে চলেছে কোথাও। এবং কুর্গের আশেপাশেই।

বব আর বিলম্ব করেনা। বেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে রওনা হয় যোসেফের বাড়ির দিকে। এমন সময় ওখানে যোসেফের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখে দৌড়ে আসে। দেখে একজন বন্দুকবাজকে ওরা কাবু করেছে। গল্প বুঝতে ববের বেশি সময় লাগেনা।

সে ইমেলের কথা বলে। ততক্ষণে ভেঙ্কি পুলিশকে খবর দিয়েছে।

এসে গেছে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের জিপ।

লোকটি ঘুষিতে বেশ কাবু হয়েছে বোঝাই গেলো। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

এই গুরু গম্ভীর পরিবেশেও বব রসিকতা করে বলে ওঠে : ভেঙ্কি তোমার দেখছি এখনো পাঞ্জায় বেশ জোর। তুমি তো আবার অলিম্পিকে নামতে পারো!

লোকটিকে নিয়ে যাবার আগে পুলিশ কিছুক্ষণ জেরা করে। জানা যায়না কিছুই শুধু মুখ থেকে একটা কাতর স্বর বেরোচ্ছিলো তার।

কফিবনের শ্যামলিমা ছাড়িয়ে ভেসে আসে বাঘের ডাক আবার।

এবার একটু দূরে। এবং ববের উপস্থিত বুদ্ধিতে বাঘ তার আলিঙ্গনাবদ্ধ।

বাঘকে জাপটে ধরেছে বব ! এতো বাঙালি ছেলেটি ! যাকে ভূতে ধরেছিলো !

হ্যাঁ শক্তি নাম তার ! চমকে উঠেছিলো গীতু। কারণ শক্তির সঙ্গে তার ইদানিং বেশ জমে উঠেছিলো। দুজনের মনে ফাগুনের রং ধরেছিলো যে। শক্তির একটি অদ্ভুত স্বভাব গীতুকে আকর্ষণ করেছিলো। সে কোনো রাস্তার পশুকে খাবার না দিয়ে নিজে খেতো না। বেশ নরম ও রুচিবান ভেবেছিলো ওকে। যদিও ওর ব্যাঙ্গালোরের ধান্দার সম্পর্কে কিছু জানতো না গীতু। সেই শক্তিকে অশুভ শক্তি রূপে দেখে খুব চমকে গেলো গীতু।

আসলে সে হরবোলা। বিভিন্ন পশু পাখির ডাক সে নকল করতে পারতো। তাই তাকেই কাজে লাগাতো উগ্রহানার দল মানুষকে তাদের কুচকাওয়াজের সীমানা থেকে দূরে রাখার জন্য। বদলে শক্তি পয়সা পেতো। তাই ব্যাঙ্গালোরের কাজ বন্ধ রেখে সে চলে আসতো প্রফেসর শ্রোত্রির বাড়ি যেখানে উগ্রপন্থীদের ছাত্রের বেশে রেখে ট্রেনিং দিতেন প্রফেসর। রাস্তায় কিংবা জঙ্গলের আশেপাশে নকল বাঘের পায়ের ছাঁচ দিয়ে ছাপ তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো ওরা যাতে জঙ্গলে বাঘ আছে ভেবে তারা সাবধানে কিছু এলাকা এড়িয়ে চলে।

মিনি গুহা , আন্ডার গ্রাউন্ড ঘরে চলতো ট্রেনিং।

সাপের রক্ত পান করে বেঁচে থাকা , পোকা মাকড় খেয়ে দিন কাটানো সমস্ত ট্রেনিং দেওয়া হত তাদের যাতে কষ্ট না হয় । শারীরিক কসরৎ ও আমর্সের ব্যবহার তো ছিলই ।

প্রফেসর আগে কয়েকটি উগ্রপন্থী শিবিরে ছিলেন ওদের কার্য কলাপ কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে । এছাড়া বেশ বদল করে পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়া , বেশ কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে পারার দক্ষতা , জেনেরাল নলেজ , বিভিন্ন ভাষার টোন সমস্ত শিক্ষাই দেওয়া হত এই শিবিরে । বলা যেতে পারে বেসরকারি আর্মি । দু তিনজন রিটায়ার্ড জেনেরালও আসতেন নিয়মিত।

কট্টর হিন্দু ত্ববাদী মারাঠার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রফেসর শ্রোত্রি !

উনি পন্ডিত , নম্র, বিনয়ী , বিদগ্ধ তবুও তাঁর যুক্তি হল হিন্দুরা সহনশীল জাত বলেই সব জায়গায় এত অবমাননা সহ্য করতে হবে তাদের ? এবার তারাও পাল্টা আঘাত হানবে । দেখিয়ে দেবে হাম কিসি সে কম নেহি । আমরা মুখ বুজে এই অত্যাচার লড়াই আর কতদিন সহ্য করবো ?

ইউ এস আর্মি থেকে এলো আলি । আলি তুখোড় বন্দুকবাজ । যোগাযোগ হল কিছু অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে । তারা নিয়মিত অস্ত্র শস্ত্র যোগান দিতে লাগলো ।

পরীক্ষা করার জন্যে , লোকক্ষয়ের জন্যে ।

প্রফেসর শ্রোত্রির যুক্তি সহজ ।

আধুনা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুর দল, পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হিন্দুরা , কাশ্মীরের ভূমিচ্যুত হিন্দু পন্ডিত , এক খ্যাতনামা মুসলিম জমিদারের এস্টেটে হিন্দুদের পোড়াতে না দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে প্রফেসররে মনে ক্ষোভ জমাট বাঁধে । উনি মনে মনে গোধরা

কান্ডকে সমর্থন করেন । বলেন মুসলিম ছেলেরা ওখানে হিন্দু মেয়েদের বাঁচতে দিচ্ছিলো না ! কাজেই টিট ফর ট্যাটে বিশ্বাসী প্রফেসর নতুনভাবে প্রতিবাদ করার রাস্তা খুঁজে নেনে । যেমন নিয়েছিলেন বাংলার কানু সান্যাল ও চারু মজুমদার । ওঁনাদের পথকে যদিও অনেকেই আজকাল উগ্রপন্থার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন কিন্তু প্রফেসর শ্রোত্রি নিজেকে উগ্রপন্থী বলতে লজ্জিত নন । উনি বলেন : আমি উগ্রতম উগ্রপন্থী ।

অন্তরে হিংসাপ্রবণ প্রফেসর একদিন শপথ নেন উনি হিন্দুদের জোটবদ্ধ করে একটি নতুন দল গড়বেন । বিজেপির কিংবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতন নয় , এরা হবেন চরম পন্থী । হিন্দুদের কি মুসলিমগুলো ভীরু মনে করেছে ? যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে তারা ভারতের মাটিতে ! ঐ পাকিস্তান ব্যাটা ! কী পেয়েছে ওরা ? কী পেয়েছে ?

আমরা এতই দুর্বল ? আর শালা শুয়ার কা বাচ্চা ঐ নেহেরু ! ঐ গান্ধী !

ভারতকে সেকুলার কান্ট্রি না করে হিন্দু কান্ট্রি করতে পারলো না ?

মুসলমানের বাচ্চাগুলোকে আর খ্রেস্টানগুলোকে দেখে নিতাম আমরা !

মাথার শিরা গুলো রাগে দপ দপ করে প্রফেসরের ।

সেই থেকেই শুরু ! একটা সুক্ষ্ম চিন্তা মাথায় এসেছিলো বহু আগে । সেটা শুরু মুম্বাই বিস্ফোরণের পরে । তারপরে সেই নিয়ে নার্চার করা ও এতকাল ধরে লোক যোগাড় , অস্ত্র যোগাড় , ইনফ্রা স্ট্রাকচার তৈরি সমস্ত করতে হল । এবার মিশন শুরু ।

এতদিনের ট্রেনিং , সঙ্ঘবদ্ধতা --মায় কিছু শ্রীলঙ্কার মানব বোমা স্পেশালিস্টও আনা হয়েছিলো জাফনা থেকে । প্রফেসর শ্রোত্রির প্ল্যান নিঁখুত । যদিও আজকাল নেটেও বোমা বানানো শেখা যায় ।

কিন্তু শেষরক্ষা হলনা । কথায় বলে রাখে হরি মারে কে ! বুকের ভেতরের দগদগে ঘা যেই প্ল্যানের উৎসস্থল সেই ঘায়ে নুনের ছিঁটে পড়লো এবার !

সার বেঁধে মানুষ চলেছে বন্দুক নিয়ে ধ্বংসের কাজে । এ কে ৪৭ এর ঢল নেমেছে শান্ত কুর্গের বনতলে । বাতাসে বরুদের গন্ধ । কোথাও বোমা বিস্ফোরণ কোথাও গোলাগুলি চালিয়ে তারা নির্মুল করে দিতে চায় সমস্ত দুর্নীতি , অত্যাচার , একচোখোমি । তাঁদের নীতি ডু অর ডাই ।

জলপাই পোশাকে কফিবন কাঁপিয়ে , ফিল্টার কফির সুঘ্রাণকে রক্তাক্ত করে দিতে

এগিয়ে চলে তারা বীরদর্পে । উঁচু নিচু পাহাড়ি পথ , পাগলা ঝোরা যেন করুণ সুরে তাদেরকে থেমে যেতে আর্তি জানায় ।

তারা তবুও দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলে । ভেঙে দাও , গুড়িয়ে দাও , ধূলিসাৎ করে দাও ! সমস্ত অরাজকতার সমস্ত অন্যায়ের ! প্রফেসর ভুলে গিয়েছিলেন যে কত মুসলিম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন , সাবারিমালায় লর্ড আয়াপ্পানের মন্দিরে যাবার পথে একটি মসজিদ হয়ে সেখানে যেতে হয় । মসজিদের প্রিস্ট কপালে বিভূতি পরিয়ে দেন তারপরে লোকে স্বামী আয়াপ্পার মন্দিরে প্রবেশ করেন ।

ভুলে যান এগুলি তাই বাড়ে সমস্যা । গান্ধীজীর অহিংসাই পরম ধর্ম মানে তো প্রতিবাদ না করা নয় , হিংসাকে বর্জন করা । অথচ

প্রফেসর হিংসার পথই বেছে নিলেন। উনি কি হিন্দু হতে পেরেছেন ? হিন্দু হওয়া কি এত সহজ ?

# ২০

দাঁড়াও !

খুব উচ্চস্বরে কফিবন কাঁপিয়ে ভেসে আসে গর্জন ! যেন মেঘের গর্জন। কেঁপে ওঠে সবুজ বনতল, চরাচর !

দাঁড়াও ! কোথায় চলেছো তোমরা ??

চিন্নাসোয়ামিজি।

তান্ত্রিক বাবা ! রোবাস্টা আর অ্যারাবিকা কফির বন থেকে ভুঁই ফুঁড়ে উঠে আসেন তিনি। পরনে সেই এক বস্ত্র। মুখে অসম্ভব এক কাঠিন্য যেন লৌহ কঠিন অবয়ব আজ , সেই খোলামেলা হাসিখুশি চেহারা নেই , নেই সারল্য।

অন্যপাশ থেকে যোসেফও হাজির । শুনেছেন তান্ত্রিক বাবার বজ্রনিনাদ সেও।

এবারে যোসেফের কথা বলার পালা !

নো নো হিন্দুস্ কুড নট ডু সাচ থিংকস্ । ইট ইজ অ্যাগেনস্ট হিন্দু ফিলোসফি ।

বেদ উপনিষদের জন্ম হয়েছে যেখানে সেখানে মানুষ এইভাবে ধ্বংসের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারেনা । তোমরা অনেক উচ্চমার্গের মানুষ তোমরা এগুলো করছো কেন ? বন্ধ করো বন্ধ করো !

যোসেফের গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা শোনায় । কর্কশ শোনায় ।

চিনাসোয়ামিজি ডাকেন আবদুল্লাহ্কে । ডাকেন রফিক কে ডাকেন তিব্বতী কিছু ছেলেকে । সবাইকে একসঙ্গে একলাইনে দাঁড় করান তারপর অদ্ভুত ঘটনা --

সবার দেহ গুলো এক একটা আলোর পাখি হয়ে যাচ্ছে !

প্রতিটি মানব সন্তান আলোর মালা হয়ে উড়ে যাচ্ছে দিকচক্রবালে ।

আজব ঘটনা । গায়ে চিমটি কেটে দেখছে সবাই যোসেফ ব্যাতীত !

তারপরে সেই আলো মিশে যাচ্ছে আকাশে , মহাশুন্যে !

মহাজাগতিক চেতনার সঙ্গে । বিন্দু বিন্দু আলো, সবুজ আলো , লাল আলো, নীল আলো , আলো আলো আর আলো !

ঠিক বিজ্ঞানের অণু পরমাণুর মতন ! প্রতিটি কোষে কোষে এখানে আলো , আলোর বিচ্ছুরণ ।

চিন্নাসোয়ামিজির কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসছে :

এবার বাছো তো কে বড় আর কে ছোট ! কার ধর্ম বড় কার ধর্ম ছোট !

বাছো, বাছো দেখি বাছারা !

সবাই নীরব হয়েই থাকে।

তাহলে কিসের জন্যে তোমাদের এত লড়াই ? কিসের আশায় ?

দেখছো না তোমরা একই অমৃতের সন্তান ? একই আলোক বিন্দু থেকে সৃষ্ট একই আলোক মালায় উদ্ভাসিত !

সবাই চুপ করে আছে। কী বলবে ? এরপরে কি কিছু বলা যায় ?

সবাই স্পেলবাউন্ড !

– উগ্রপন্থা ! উগ্রপন্থা মানে কি জানো ? সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করা। কিছু দরিদ্র মানুষের পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নিলে , ভাত কাপড়ের ভার নিলে তারা নিজেদের জীবন উগ্রপন্থীর কল্যাণে উৎসর্গ করে দিতেই পারে !

আর টেররিজম তো জগৎ জোড়া এক ব্যাবসা। এই যে এত অস্ত্র শস্ত্র বোমা তৈরি করছে বিভিন্ন দেশ তার পরীক্ষা হবে কী করে ? উগ্রহানায় সাধারণ মানুষের প্রাণ নিতে সেই অস্ত্র ব্যাবহৃত হচ্ছে ,বদলে অর্থ পাচ্ছেন উগ্রপন্থীরা। অহিংসা দিয়েই আসবে সমাধান। হিংসার পথে নয়। এতে সমাজে মনোবিকৃতি বেড়ে যাবে। মানুষের মনে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে কিছু মানুষ তার ফায়দা লুটতে চাইছে , ধর্মের কথা একেবারেই মিথ্যে। কোন ধর্ম হিংসা প্রচার করেনা। যারা ওসব বলে তারা ধর্মের কিছুই বোঝেন না !

চিন্ময়ানন্দজির কথাগুলো যেন মন্ত্র মুগ্ধ করে রেখেছে বাকি লোকগুলোকে।

দেখছো না তৃতীয় বিশ্বে এত লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে সারা দুনিয়ায় তো খাদ্য ও জল, পেট্রলের ওপরে চাপ পড়ছে। কিছু

লোকক্ষয় করতে না পারলে প্রথম বিশ্বের সমূহ বিপদ তাই উগ্রপন্থার নামে এই হানাহানির ব্যবসা খুলে বসেছে কিছু মানুষ।

তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না ! টেররিজম ইজ আ বিজনেস।

সারি সারি পিঁপড়ের মতন দাঁড়িয়ে সৈনিকেরা ।। তারাও শুনছে। শুনছে জলপাই পোশাক । শুনছে ধরাতল, আকাশ , বাতাস , ভ্যানিলা বন।

তান্ত্রিকবাবা ব্যক্ত করে চলেছে হিন্দুত্ববাদের আসল রূপ । কত সুন্দর কত উদার সেই রূপ ! কত সহজ , সত্য !

সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই , জাতপাত নেই। শুধু আলোর কথা , শুধু আশার কথা। ভালোবাসার কথা। অমৃত প্রেমের বাণী !

ভালো করো ভালো থেকেও ভালো রেখো ---

বাস্তব জগতে হয়ত হাস্যকর শোনাবে ! কিন্তু সোয়ামিজির কথাগুলো এদেরকে একটা অদ্ভুত মায়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে । এই হিন্দুত্ববাদে নেই ববের মতন সমকামীর প্রতি ঘৃণার কথা। কারণ সেও তো অমৃতের সন্তান ! তার লিঙ্গ , যৌন পছন্দ যাই হোক না কেন ! আসল তো সুন্দর মন , হ্যাঁ মন একটা পরিচ্ছন্ন মন থাকা প্রয়োজন !

সমাজপতিদের নিজেদের খেয়ালে তাঁরা ধর্মকে কুক্ষিগত করে ফেলার প্রয়াসে ব্রতী হয় তার থেকে সৃষ্টি হয় নানান বাদানুবাদ। নানান জটিলতা। সো- অহম কথাটা খুব গভীর। তাতে তলিয়ে যাওয়া যায় --সেই মহাসমুদ্র আনন্দ লহরীতে পরিপুর্ণ !

আনন্দই ব্রহ্ম ! মারণাস্ত্র ব্রহ্ম নয় । উগ্রবাদ ব্রহ্মের হদিস দিতে পারেনা।

আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে কি হিংসা বীজ বপন করা যায় !

যোসেফ আগেই এইসব পড়েছে ! আগেই জেনেছে । মুগ্ধ হয়েছে হিন্দু দর্শনের পরশে ।

নন ডুয়ালিজম । সবাই এক , একই ব্রহ্ম ! ফর্মলেস লর্ড ! ওদের জিসাস ছিলেন সেই ফর্মলেস লর্ডের সন্তান । ইসলামের আল্লাহ্ ! সবাই ফর্মলেস । পরমানন্দ !

জ্যোতি ! এক চুম্বকের মতন জ্যোতি ! পরম শান্তির হদিস দেয় যেই জ্যোতি ! তা কখনো মানুষ হনন করে পাওয়া যায় না ! সেই শান্তি ভিন্ন শান্তি !

গতানুগতিক সাংসারিক শান্তি কিংবা প্রাকৃতিক রূপমাধুরী পানের অথবা যৌন আনন্দের মতন আনন্দ নয় । এই আনন্দ চিরস্থায়ী !

আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে যোসেফের চোখ থেকে । মজা করে একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে নন ডুয়ালিজমের ব্যাড এফেক্ট কি । তাতে বাবা কিছু বলার আগেই ভেঙ্কি বলে উঠেছিলো : কারোর কোনো অ্যাচিভমেন্টস্ নিজ নামে চলিয়ে দেওয়া । হা হা হা : তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে ।

এসব চাঁদও শুনেছে । কবিগুরুর ঐ গানটার কথা তার মনে পড়ে যায় :

এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলো ,

আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে !

সেই মুক্তির কথাই তো বলছেন তান্ত্রিক বাবা !

খবরের কাগজে কতনা বদ তান্ত্রিক এর কথা পড়ে যারা অর্থের বিনিময়ে কূকীর্তি করে কিন্তু এই বাবাজী অত্যন্ত সৎ আত্মা। ইনি আলোর ঠিকানা দিচ্ছেন।

মাধব তাকে ক্ষেপাচ্ছিলো : তুমি নাকি আজকাল জীব জন্তুর ওপরে হোমিওপ্যাথি

ফলাবার চেষ্টা করছো ? গবেষণা করছো ?

হ্যাঁ।

হাসালে পুণম ! মানুষেরই এতে কাজ হয় কিনা সন্দেহ তো গরু ঘোড়া !

হয় হয়। জীবের কাজ আরো বেশি হয় !

আজকে তার মাধবকে দেখাতে ইচ্ছে করছে যে : দেখো তান্ত্রিকবাবাও বলছেন যে আমরা সবাই সেই একই চেতনার অংশ। তাহলে ওদের ওপরে কাজ হবেনা কেন ?

কিন্তু এই মুহূর্তে মাধব এখানে নেই। হয়ত সে ফুলের বাগিচায়। চাঁদও এই পথ দিয়ে যেতে যেতে হৈ চৈ দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে এখানে।

তখন দেখে যে মহাসংগ্রাম চলেছে।

এক ঐশ্বরিক সত্ত্বা অর্থাৎ চিন্নাসোয়ামিজি যাঁকে সে বাবা বলে উনি এক দঙ্গল জলপাই পোশকে সৈন্যবাহিনী কে ভাষণ দিচ্ছেন। এরকম ভাষণ দিতে চাঁদ তাঁকে আগে কখনো দেখেনি নি।

এরপরের ঘটনা গতানুগতিক। হঠাৎ করে এই ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ উগ্রপন্থীদের ডেরা হয়ে ওঠায় স্থানীয় মানুষ কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

প্রফেসর শ্রোত্রির ভালোমানুষ মুখোশের আড়ালে এক ঘৃণ্য আসামীর মুখ দেখে মানুষ বিহ্বল !

তাহলে কাকে বিশ্বাস করবে তারা ?

পুলিশকে খবর দিয়েছিলো বব ! চিরটাকাল তার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করেছে মানুষ আজ সে নিজেই বুক ফুলিয়ে পুলিশের দরবারে। একটি পথভ্রষ্ট ইমেল বাঁচিয়ে দিলো কফি প্রান্তরকে।

ওর অভিযোগ শুনে ততক্ষণাৎ পুলিশ হাজির বড় কর্তাকে নিয়ে প্রফেসরের বাড়ি।

কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে ! প্রফেসর বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। গ্রেপ্তার হয়েছে নব নির্মিত দলটি। আলি ও অন্যান্য লোকেরা , যারা ওদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ট্রেনিং দিতো।

শকুন্তলা দেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

এই সন্ত্রাসের খবর তাঁর কানে পৌছাতেই উনি অজ্ঞান হয়ে যান। কারণ উনি দেখেছিলেন যে কূর্গের আকাশে ঘনিয়ে আসছে কালো মেঘ।

তবে ঠিক কী কারণে উনি জঙ্গলের একধারে এলাচ বাগানে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন তা কেউ জানেনা। হর্ষ না বিষাদ ? নিজের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় নতুন করে পেয়ে নাকি অন্য কোনো কারণে তা জানা যায়নি।

# উপসংহার

কুয়াশা ঢাকা পথে হেঁটে যাচ্ছে কোদাওয়া প্রজাতির দেবী চাঁদ। সঙ্গে মাধব। সামনেই ওদের বিয়ে। একসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটানোর পরিকল্পনা করেছে ওরা। সেইমত বিয়ে করবে কিন্তু ওরা ঠিক করেছে বিয়ে করবে খ্রীস্টান মতে। কারণ ওরা শিখেছে যে সব ধর্মই একই পথের পথিক কাজেই যেই মত ওদের ভালোলাগবে সেইমতেই ওরা বিয়ে করবে। মাধবকে ছেড়ে আর থাকা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত কান্ড আরো একটা হয়েছে। যোসেফের কফিবনে যেই কফি গাছটিতে ফুল হতনা সেই গাছটি হঠাৎ কোনো অজ্ঞাত কারণে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

সেই পুষ্পিত কফি পল্লবের দিকে চোখ ফেরানো দায়। ফুলগুলো যেন আজ হঠাৎ- ই সমস্বরে হাসছে ! ভীষণ হাসছে।

ভেঙ্কি ও যোসেফের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছে। ভেঙ্কির মেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। সে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছিলো তাকে একটি সংস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। সুস্থতার জন্য। ভেঙ্কির ইলেজিটিমেট কবি পুত্র গিয়ে তার সহোদরাকে দেখে এসেছে। তার সুস্থতা কামনা করে সুন্দর কবিতা লিখেছে মেয়েটির প্রচন্ড গদ্যময় জীবনে যা এনেছে স্নিগ্ধ বাতাস। পুলিশের শকুন্তলার ওপরে সন্দেহ বাড়লেও প্রমাণের অভাবে তাকে হ্যারাস করা বন্ধ করেছে তারা।

চিন্নাসোয়ামিজী আর তলা কাবেরীতে থাকেন না। এক শুভ লগ্নে উনি দেহত্যাগ করেছেন। যখন কাবেরী মায়ের পুজো চলছিলো সেই সময় উনি মহানির্বাণে চলে যান। আকাশে দেখা গিয়েছিলো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

তান্ত্রিক বাবা দেহত্যাগ করার পরও সাতদিন ওঁনার মৃতদেহ অবিকৃত ছিলো।

ওঁনার ইচ্ছে মতনই ওঁনার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য যাঁদের মধ্যে তিব্বতী ছেলেটি ছিলো –ওঁনাকে সমাধিস্থ করেন পাহাড়ের ধাপে। একটি চন্দন গাছের নিচে। শোনা যায় আজও ভক্তদের দেখা দিতে উনি মাঝে মাঝে আবির্ভূত হন। যেমন হয়েছিলেন চাঁদের প্রথম একজোড়া সন্তান ( কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ) ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে , হাসপাতালের বেডের কাছে।

একটি আলোর রেখা এসে ঘরের মেঝেতে পড়লো। সেই আলো জমাট বেঁধে হয়ে উঠলো তান্ত্রিক বাবা। চাঁদ চমকিত। হাসপাতালের ঘরটি ভরে গেছে পুরনো কফির ঘ্রাণে। উনি আশীর্বাদ করে বললেন : তোমার সন্তানকে জাতপাতহীন এক মানুষ করো যে শুধু আলোর হদিস করে। কোনো ধর্মের টিকিট না লাগিয়ে মনুষ্যজাত চেতনার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে। সেই জন্যেই আমি এসেছি।

এই সন্তানেরা ফুলের সন্তান। আলোর সন্তান।

এবং আশীর্বাদ করেন চিরাচরিত হিন্দু ফুল না দিয়ে একটি পুষ্পিত কফি পল্লব দিয়ে !

চাঁদের একটি সন্তানকে দত্তক নিয়েছে বব ও রফিক। নাম দিয়েছে নতুন দিশা।

আর হ্যাঁ কোনো পদবী জোড়েনি নামের সঙ্গে।

এক অদ্ভুত নাম ! একটি শব্দ নয় একজোড়া শব্দ নামের আকারে জ্বল জ্বল করছে।

দূরে কূর্গের সুনির্মল আকাশে তখন একফালি স্নিগ্ধ চাঁদ আর কোটি কোটি জাজ্বল্যমান নক্ষত্র। ধনিষ্ঠা , অরুন্ধতী , শতভিষারা !!

হেমন্তের বিষ পারেনি এই সব তারায় তারায় একটু কুও তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে।

হেমন্ত তাই আজ সুনির্মল। হেমন্তে বিষ নেই। নেই হেমন্তের বিষ !

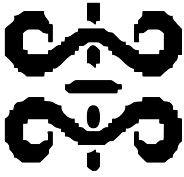

কুর্গ সম্পর্কে নানান মূল্যবান তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে , পি টি বোপান্নার বই - ডিসকভার কুর্গ ও ক্লাব মহিন্দ্রার ম্যাগাজিন হ্যালো থেকে ।

তান্ত্রিক বাবার চরিত্রটি জীবিত ও মৃত বিভিন্ন সাধকের জীবনের নানান ঘটনা দেখে সেইভাবে আঁকা হয়েছে ।

দার্শনিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে আন্তর্জালের নানান ওয়েবসাইট থেকে ।

কৃতজ্ঞতা রইলো ।

# The End